কাল-বৈশাখী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়-লিখিত

দাম দেড়টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীহেমচন্দ্র রায়,
বিউটী প্রেস
২৪২-১ অপার সারকিউলার রোড,
কলিকাতা।

নববধূ কমল-বাসিনী,

প্রেমাঙ্কুরের ঘুমিয়ে-পড়া দোসরহারা জীবনে,

ভোরের কনক-প্রভার মত,

যেদিন এসে তুমি সোণার-কাঠি ছুঁইয়েছ,

সেই শুভদিনের অভিজ্ঞান-রূপে

আমার এই বইখানি তুমি গ্রহণ কর।

রূপকথার স্বপ্নলোকের মত,

সনাথ তোমার জীবন

বিচিত্র ও মধুর হ'য়ে থাক্,

বন্ধুর এই একান্ত কামনা।

কাল-বৈশাখী

এক

পুরন্দরের কথা

বৈকালে শ্রী যখন আমার সাম্‌নে জল-খাবারের থালা এনে ধর্‌লে, আমি বললুম, "ওগো শ্রী, বিনোদকে মনে পড়ে ?"

ভুরু কুঁচ্‌কে শ্রী বল্‌লে, "বিনোদ ? কে বিনোদ ?"

"তুমি হাসালে শ্রী—বিনোদকে চেন না !"

"[illegible] সব-তাতেই হাসি আসে ! বিনোদ আবার কে ?...... কৈ, মনে পড়্‌চে না ত !"

"সে কি ! যার পরিত্যক্ত সিংহাসনে আজ আমি একছত্র সম্রাট হ'য়ে বসেছি, তোমার হাতের বরমাল্য যার কণ্ঠ থেকে আমি একের নম্বরের দুরাত্মার মত কেড়ে নিয়েছি,—সেই—"

শ্রীর মুখের ভাব বদ্‌লে গেল। তাড়াতাড়ি বিরক্ত স্বরে সে ব'লে উঠ্‌ল, "ও, থামো থামো, অত আর ব্যাখ্যানা কর্‌তে হবে না—"

—"কেমন, এবার চিনেছ ত ?"

শ্রী মৃদুস্বরে বল্‌লে, "হুঁ ।"

—"তবু ভালো! কবিরা বলেন, পুরণো প্রেম ভোলা যায় না। কিন্তু তুমি দেখছি কবিদের বচনকে অসার বলে প্রমাণ করতে চাও!"

চোখ রাঙিয়ে শ্রী বল্লে, "স্থাখো, ঠাট্টারও একটা সীমা আছে!"

—"কিন্তু প্রিয়তমে, সে সীমা আমি ত এখনো লঙ্ঘন করি-নি!"—এই বলে আমি জলখাবারের থালার দিকে হাত বাড়ালুম।

শ্রী কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর আস্তে-আস্তে বল্লে, "তা কি বলছিলে, বলনা, থামলে কেন?"

—"তোমার ভয়ে।"

—"আমার ভয়ে! এমন কপাল কি আমার হবে গো!"

—"বটে! তাহ'লে তুমি এই চাও যে, আমি তোমাকে ভয় করি?"

—"সকল স্ত্রীই চায়।"

—"সকল স্ত্রীই চায় যে স্বামীরা ভালো না বেসে, খালি ভয়ে ভয়ে স্ত্রীর কাছে হাত-যোড় করে বসে থাকুক্?"

—"না, তা কেন? তোমরা আমাদের খানিক ভালোবাসবে, খানিক ভয় করবে; খানিক আদর করবে, খানিক সম্ভ্রম করবে।"

—"অর্থাৎ, সোজা কথায়—খানিক বুকে করব, খানিক মাথায় করব; খানিক হাসব, খানিক কাঁদব? এই হ'ল গিয়ে আদর্শ স্বামীর লক্ষণ—কেমন?"

শ্রী হেসে বল্লে, "তুমি আবার হয়কে নয় করছ—অতটা করতে কি আমি বলছি গা!"

—"যতটা বলেছ, তার কারণটা কি শুনতে পাই না?"

—"কারণ আছে অনেক। এই যেমন, ধর, তুমি যদি আমাকে একটুও

মেনে চল্‌তে, তাহ'লে আমি যাতে কষ্ট পাই তেমন কাজ কখনো কর্‌তে না।"

—"তুমি যাতে কষ্ট পাও, এমন কি কাজ আমি করেছি শুনি? আমি ত জানি স্ত্রী-ভক্ত স্বামী বলে বাজারে আমার অত্যন্ত দুর্নাম।"

শ্রী হাত নেড়ে বল্‌লে, "ভাগ্যে তোমার মুখখানি ছিল, তাই এ যাত্রা তুমি তরে' গেলে গো। তুমি আবার স্ত্রী-ভক্ত—পোড়াকপাল!"

আমি মুখে গাম্ভীর্য্যের বোঝা নামিয়ে বল্‌লুম, "প্রমাণ কর, যে আমি স্ত্রীভক্ত নই!"

—"অত প্রমাণ-ট্রমান আমি জানি না। এই যে রোজ সন্ধ্যেবেলায় তুমি ও-বাড়ীর ঐ ধাড়ী ছুঁড়িগুলোর সঙ্গে বসে গান গাও, গল্পগুজব কর, এটা কি স্ত্রী-ভক্তের লক্ষণ?"

বুঝ্‌লুম, শ্রীর কোন্‌খানে ব্যথা! শ্রীর এই সন্দেহ, এই ঈর্ষা আজ এতদিনেও আমি কোনমতে দূর কর্‌তে পার্‌লুম না। তার বিশ্বাস, আমাকে লুকে নেবার জন্যে যত-রাজ্যের নবযৌবনারা লুব্ধ-নয়নে চারিধারে ওঁৎ পেতে বসে আছে। এই সন্দেহের জন্যে মাঝেমাঝে আমাকে কি মুস্কিলেই পড়্‌তে হয়!

জল খেয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত-মুখ মুছতে মুছতে আমি বল্‌লুম, "কিন্তু শ্রী, তুমি একটা মস্ত ভুল কর্‌ছ। তুমি কি ভাবো যে, তোমার এই একান্ত-অনুগত স্ত্রী-ভক্ত স্বামীটিকে বিদ্রোহী কর্‌বার চেষ্টা ছাড়া ও-বাড়ীর মেয়ে-গুলির হাতে আর কোন কাজ নেই?"

শ্রী বল্‌লে, "জানি গো জানি, তোমার এই কার্ত্তিকের মত চেহারা দেখে সব মেয়েই মন হারিয়ে বসে থাকে!"

নিজের চেহারা সম্বন্ধে এত-বড় সার্টিফিকেট পেয়ে আমি হো-হো করে হেসে উঠ্‌লুম। তার পর শ্রীর একখানি হাত ধরে বল্‌লুম, "আচ্ছা, স্বীকার কর্‌লুম সব মেয়েই আমাকে দেখে ভুলে যায়। কিন্তু স্থধু এক পক্ষ ভুল্‌লেই ত চল্‌বে না,—তারা ভুল্‌লেও এ পক্ষ ভুল্‌বে কেন?"

শ্রী চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লে, "আগুণের কাছে থাকুলে ঘী একদিন-না-একদিন গল্‌বেই-গল্‌বে!"

—"মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তুমি এ-কথা কেন ভুলে যাচ্চ যে, তোমার ঐ রূপের আগুণে ঘী অনেকদিন আগেই গলে গেছে। গলানো ঘীকে আর কেউ ত গলাতে আস্‌বে না শ্রী!"

শ্রী এবারে রাগ করে বল্‌লে, "ভাখ, তোমার সঙ্গে একটা কথা কয়েও যদি স্থখ আছে! হচ্ছিল এক কথা, এল ধান ভান্‌তে শিবের গীত। যে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, তার আর কোন জবাব নেই।"

—"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, বড্ড ভুলে গেছি বটে—তুমি বিনোদের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ ত?"

—"হ্যাঁ।"

—"এতদিন পরে বিনোদের আবার দেখা পেয়েছি। আমাদের পাশের বাড়ীখানা সে ভাড়া নিয়েছে।"

—"তোমার সঙ্গে সে কথা কইলে?"

—"তা কইলে বৈকি! সে নিজেই আমাদের বাড়ীতে এসেছিল—হাজার হোক্ সে আমার ছেলেবেলার সাথী ত! আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল বলে সে ভারি দুঃখিত হয়েছে।"

—"এতদিনে তার বিয়ে-থা হয়ে গেছে ত!"

—"তা হয়েছে বৈকি!"

—"শ্বশুরের গলা কেটে এবার ক'টি হাজার টাকা আদায় করেছে?"

—"ও-সব কথা জিজ্ঞাসা করবার আমার সময় হয়-নি—ইচ্ছেও ছিল না। তা বেশ, তোমার সঙ্গে ত তার আলাপ করিয়ে দেব, তুমিই না-হয় তার কাছ থেকে যা জান্‌বার জেনে নিও।"

মাথা নেড়ে শ্রী বল্‌লে, "না না না,—ও-সব আলাপ-টালাপ আমার সঙ্গে হবে না।"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লুম, "সেকি, সে যে আমার বাল্যবন্ধু!"

—"তোমার বাল্যবন্ধুকে তুমি মাথায় করে নাচো—তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

—"তা হয় না শ্রী! বিনোদ যে আজ্‌কেই আমার সঙ্গে তার স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে! বল্লে, তার সদরে-অন্দরে আমার অবারিত দ্বার।"

—"এরি-মধ্যে তার স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ করে আসা হয়েছে বুঝি? বেশ, শুনে সুখী হলুম! কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার ঐ বিনোদের কিছুতেই খাপ হবে না—ও-সব সায়েবী-আনা আমার ভালো লাগে না।" এই বলে শ্রী রাগে গর্‌গর্ কর্‌তে-কর্‌তে আমার কাছ থেকে চলে গেল।

তা, শ্রীর রাগের কারণও আছে। বিনোদের হাতে একদিন তাদের কম লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌তে হয়-নি ত!

একটা সিগারেট ধরিয়ে, ইজি-চেয়ারে হ্যালান দিয়ে শুয়ে, সেই পুরাণো দিনের কথা ভাবতে লাগলুম :—

আমি আর বিনোদ তখন এম-এ পাশ দিয়েছি। বিনোদ মেডিক্যাল

কলেজে ঢুকেছে,—সেইসঙ্গে আমারও ডাক্তারী পড়্‌বার কথা ছিল; কিন্তু হঠাৎ বাবার মৃত্যু হওয়াতে আমার আর ডাক্তারী পড়া হ'ল না। বাবা অনেক বিষয়-সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন—আমাকে তারই তত্ত্বাবধানে লেগে থাকৃতে হ'ল।

বছর-খানেক পরেই শুন্‌লুম, বিনোদের বিবাহ। বিনোদ এসে আমাকে নেমন্তন্ন করে' গেল।

বিবাহের দিন বরযাত্রী হয়ে গেলুম। কম্বুলেটোলায় একটা অন্ধকার-ঘুটঘুটে, সাপের দেহের মত পাক-খাওয়া, সরু গলির ভিতরে কনের বাড়ী। বাড়ীখানা পুরাণো, ছোট, ভাঙাচোরা, হেলে-পড়া; তার চুণ-বালি খসে ক্ষয়া-ক্ষয়া ইটগুলো পচা মড়ার দেহের ভিতর থেকে হাড়ের মত বেরিয়ে পড়েছে;—নীচের দিকটায় যতখানি হাত যায় ততখানি পর্য্যন্ত ঘুঁটে দেওয়া। বাড়ীর মালিক বিনোদের হবু-শ্বশুরের চেহারাখানিও ঠিক বাড়ীর সঙ্গে ছন্দ-তাল-মাত্রা বজায় রাখতে পেরেছে। শুন্‌লুম বয়স তাঁর বছর পঞ্চাশ—কিন্তু দ্যাখাচ্ছে ঠিক আশীবছরের জরাজীর্ণ ভেঙে-পড়া বুড়োর মতন। মাথার চুল তুলোর মত সাদা, মাথাটি বুকের পরে নুয়ে পড়েছে, দেহের উপরদিক্‌টা বাজারের ভাগা-দেওয়া কুমড়োর ফালির মত বেঁকে গেছে—চল্‌তে-ফির্‌তে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছেন। এমন-একটা শুভকার্য্যেও তাঁর মুখে হাসির আভাসটি পর্য্যন্ত নেই—চোখ-দুটিও ভাবহীন, দু-দুটো পাথরের চোখের মত! ভদ্রলোক নব্বই টাকা মাহিনার একটি চাকরি করেন; এই বয়সে একে একে পাঁচটি মেয়ে পার করেছেন—এটি হচ্ছে ষষ্ঠ এবং এর কোলে নাকি সপ্তমও আছে। কিন্তু সপ্তম কন্যাটির বিবাহ হবার আগেই এই বাড়ীখানি যে পড়ে যাবে এবং সেইসঙ্গে এই সাত-মেয়ের

অন্তঃপুরের ভিতর থেকে মেয়েদের তীক্ষ্ণ-স্বরে কান্না, কন্যাপক্ষের সকাতর অনুনয়-বিনয় এবং বরপক্ষের অবিরাম তর্জ্জন-গর্জ্জন—এই সব বিচিত্র অনৈক্যতানে হিন্দুসমাজের অপূর্ব্ব মহিমা অক্ষুণ্ণ সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

কন্যার দিকে তাকিয়ে দেখি, সে বেচারী এই শুভবিবাহের সূচনা দেখেই চেলির কাপড়ের ঘেরাটোপের মধ্যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে।

আমি আস্তে আস্তে বিনোদের সাম্‌নে গিয়ে বল্লুম, "বিনোদ, তুমি এখন কি কর্‌তে চাও?"

বিনোদ সহজ স্বরেই বল্‌লে, "কি আর কর্‌ব, বাড়ী যাব!"

কন্যার ভূলুণ্ঠিত দেহের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে' আমি বল্লুম, "আর ও-বেচারীর দশা কি হবে?"

সেদিকে একবার তাকিয়ে, কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বিনোদ বল্লে, "আমি কি জানি?"

—"লেখাপড়া শিখেও এমন কথা বল্‌তে লজ্জা হ'ল না তোমার?"

বিনোদ তীব্র পরিহাসে বল্লে, "লজ্জা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম—আমি পুরুষ।"

—"কিন্তু তোমার বিবাহে বরযাত্রী হয়ে এসেছি বলে আমার লজ্জা কর্‌ছে।"

—"তাহলে আমার বদলে তুমিই বর হয়ে তোমার লজ্জা নিবারণ কর।"

—"হ্যাঁ, আমি তাইই কর্‌তে চাই।"

ফিরে দেখি, কন্যার পিতা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা শুন্‌ছেন। তাঁর পাথুরে চোখদুটি আর নড়ছে না—তারা যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে!

আমি তাঁকে বল্লুম, "আপনার যদি অমত না হয়, তাহ'লে আপনার মেয়েকে আমি বিবাহ করব।"

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তিনি বল্লেন, "আপনি,—আপনি—"

আমি হেসে বল্লুম, "ভয় নেই, আমি আপনাদেরই জাতি—গোত্রেও আট্‌কাবে না।"

—"কিন্তু—"

—"এর-মধ্যে একটুও 'কিন্তু' নেই। আমি এম-এ পাস, আমার বাড়ী কল্‌কাতায়, আমার আয় মাসে দু-হাজার টাকারও বেশী। কেমন বিনোদ, আমি মিছেকথা বল্‌ছি কি ?"

বিনোদ হতভম্ব হয়ে আমার দিতে ফ্যাল্‌ফেলে চোখে তাকিয়ে রইল।

কনের বাপ একহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে, আর-একহাতে আমার একখানা হাত ধরে বল্‌লেন, "বাবা, তোমার মন খুব উঁচু, কিন্তু এ বিবাহে তোমার মত হ'লেও তোমার বাপ-মায়ের—"

বাধা দিয়ে আমি বল্লুন, "তাঁরা পরলোকে।"

—"আমাকে কি দিতে হবে বাবা ?"

—"কিছু না। যে টাকা আর গয়না জোগাড় করেছেন, সে-সব আপনার ছোট মেয়ের বিবাহের জন্যে রেখে দিন।......আর অন্দর-মহল থেকে কান্নার আওয়াজ ক্রমেই যেন বেড়ে উঠ্‌ছে—আগে ওটা বন্ধ করতে বলুন, বিয়ের সময়ে কান্না-টান্না আমার একেবারেই সহ্য হয় না।"

আনন্দে পাগলের মত হয়ে আমার ভবিষ্য শ্বশুর-মশাই চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওগো কান্না থামাও গো কান্না থামাও, আমি সাক্ষাৎ দেবতাকে জামাই পেয়েছি।"

সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের গলা শোনা গেল, "লগ্নের আর দেরি নেই, বর কোথায় ?"

কন্যাপক্ষের সকলে মিলে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আনন্দধ্বনি কর্‌তে লাগ্‌ল।

এর-মধ্যে বিনোদ আমার কাছে এসে বল্লে, "তুমি বন্ধু হয়ে আমাকে অপমানটা করতে চাও ?"

আমি হাসিমুখে বল্লুম, "বন্ধু, সামান্য টাকার লোভে তুমি যখন এমন পরমা সুন্দরী মেয়েকে ত্যাগ কর্‌লে, তখন একে গ্রহণ করাই হচ্ছে আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কার্য্য।"

বিনোদ খানিক ইতস্তত করে' শেষটা বল্লে, "আচ্ছা, বাকি টাকা আর গয়না যদি একসপ্তাহের মধ্যে পাই, তাহলে এ-বিবাহে আমি রাজি আছি। কি বলেন বাবা ?"

বিনোদের পিতা মুখ বিকৃত করে' বল্লেন, "কাজেই !"

কিন্তু মেয়ের বাপ মাথা নেড়ে বল্লেন, "সে আর হয় না। আপনারা আমাকে যে অপমান করেছেন তা আমি জীবনে ভুল্‌ব না। এর পরেও আপনাদের ঘরে আমি আর মেয়ে দিতে পার্‌ব না !"

* * * *

শ্রীর সঙ্গে এম্‌নি করে'ই আমার বিবাহ হয়।

বিবাহের পর পাঁচবছর কেটে গেছে, এই পাঁচ বছর আমি বিনোদের দেখা পাই-নি। সে যে আমার উপরে মর্ম্মান্তিক চটে গিয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই।

এতদিন পরে সেই বিনোদ আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে। শুধু ফিরে আসা নয়, এখন সে আমার প্রতিবেশী!

কিন্তু আমার উপর থেকে বিনোদের রাগ পড়ে গেলেও, বিনোদের উপরে শ্রী দেখছি এখনো দস্তুরমত চটে আছে! তার এ রাগ কি আর সহজে পড়বে?

দুই

বিনোদের কথা

হুঁ, পুরন্দর ভেবেছে আমি সে অপমান ভুলে গেছি! নির্ব্বোধ, অপমান আমি ভুলি না!

না, অপমান আমি ভুলি না—এ স্বভাব আমার চিরকালের। ছেলে-বেলায় স্কুলে আমার এক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, বিনয়। তার জন্যে মাষ্টারদের কাছে প্রায়ই আমাকে মার খেতে হ'ত। তারপর কলেজে ঢুকে পর্য্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আর আমার অনেকদিন দেখা হয় নি। গেল-বছরে হঠাৎ সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সে নাকি ভারি গরীব, তার এক ছেলের বড় অসুখ—আমি তার বাল্যবন্ধু, ডাক্তার হয়েছি, যদি দয়া ক'রে তার ছেলেকে দেখি—এই ছিল তার অনুরোধ। কিন্তু তার সে অনুরোধে আমি কর্ণপাত করি-নি; এর কারণ, তার টাকা খরচ কর্‌বার অক্ষমতা নয়—তার বাল্যকালের শত্রুতা আমি ভুলি-নি বলেই তার অনুরোধে আমি উপেক্ষাপ্রকাশ করেছিলুম।......তাকে ফিরিয়ে দিতে আমার একটুও কষ্ট হয় নি, বরং তার নিরাশ মুখ দেখে আনন্দে আমার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল!

বিনয়ের অপরাধ ত পুরন্দরের তুলনায় কিছুই নয় বল্লেই হয়! কিন্তু আমি বিনয়কেই যখন ক্ষমা করি-নি, তখন পুরন্দরকেও যে করব না, এ একেবারে ধরা কথা! তা করলে অসঙ্গত হবে—মানুষের চরিত্রের মধ্যে অসঙ্গতি থাক্‌লে তার পরকালের আশা একেবারে ঝর্ঝরে হয়ে যায়।

নীতিবাগীশ এখানে বল্‌বেন, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, জীবে দয়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, নিষ্ঠুরতা মহাপাপ। কিন্তু নিষ্ঠুরতাকে যদি পাপ বল, তবে সে পাপে লিপ্ত না হ'লে পৌরাণিক ভীমার্জ্জুন থেকে সুরু করে' আধুনিক নেপোলিয়ন পর্য্যন্ত কেহই মহামানবে পরিণত হ'তে পার্‌তেন না। জগতের জীবন-সংগ্রামে ঢুকে, যারাই দয়া করেছে তারাই মরেছে, যেমন হরিশ্চন্দ্র। আবার দেখ, বামনকে দয়া করে' বলি এই ফললাভ কর্‌লেন যে, ক্ষুদ্র বামন উচ্চ [illegible] তাঁরই মাথার উপরে দিব্য দু-পা দিয়ে দাঁড়ালেন। এখানে হার হ'ল দয়[illegible]র এবং জিৎ হ'ল নিষ্ঠুর বামনের এবং জগতে সেই সফল নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত চির-জাগ্রৎ রাখবার জন্যেই, আজও দস্তুরমত ঘটা করে' বামনের নিত্য পূজা হচ্ছে। হ্যাঁ, বামন হচ্ছেন চরম নিষ্ঠুরতার আদর্শ দেবতা।

আমিও নিষ্ঠুর হ'তে চাই। ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি পুঁথির বাঁধা গতে, বড় বড় বুলিতে আমি ভুল্‌তে চাই না, সে সবে ভুল্‌লে পুরন্দরকে শিক্ষা দেওয়া হবে না।

সেদিনকার সে অপমান আমার বুকের ভিতরে যে জ্বলন্ত চিতা রচনা করেছে, যতদিন না এর উচিতমত প্রতিশোধ নি, ততদিন সে আগুনে শান্তিজল পড়বে না, পড়বে না! সেই বিবাহ-সভায় আমরা এমন কি অন্যায় করেছিলুম জানি না,—কিন্তু তাই নিয়ে চারিদিকে কতদিন ধরে

কী ঘোঁট কী টিট্‌কিরি,—এমন-কি আত্মীয়-কুটুম্বদের কাছে দিনকতক আমাদের মুখ-দেখানো পর্য্যন্ত ভার হয়ে উঠেছিল। পথে সাক্ষাৎ হ'লে বন্ধু-বান্ধবরা অনেকে আবার কথা না-কয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত—যেন আমরা হাড়ী, কি মেথর! ওঃ, সে অপমান কি ভুলতে পারি?

সুধু অপমান বলে নয়, পুরন্দর আমাকে বড় দাগাই দিয়েছে! শ্রী—শ্রী! তার জন্যে আমি শ্রীকে হারিয়েছি!......এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়ে, যেদিন তাকে প্রথম দেখেছিলুম, সেদিন তার রূপের বিদ্যুতে চোখ আমার ঝল্‌সে গিয়েছিল! বাঙালীর ঘরে যে এমন জীবন্ত রূপের প্রতিমা থাকতে পারে, এ আমি কখনো কল্পনাও করতে পারি-নি।......ছেলের একান্ত ইচ্ছা দেখে বাবা বেশী প্রাপ্তির আশা ছেড়ে শ্রীর সঙ্গেই আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করলেন—অর্থাৎ স্থির করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু হায় রে কপাল, যে দুর্লভ রত্নকে আবিষ্কার করলুম আমি, তাকে লাভ করলে অপরে,—আমার ভাগ্যে খালি কাদা ঘেঁটে মরাই সার হ'ল।

বাস্তবিক, সভার মধ্যিখানে পাওনা নিয়ে অতটা গোলমাল করা আমাদের পক্ষে কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাও বলি, ব্যাপারটা যে অমন গুরুতর হয়ে উঠবে, এও আমরা ভাবি-নি! আমরা ত সত্যিই সভা ছেড়ে চলে আস্‌তুম না,—ভেবেছিলুম, একটু বেশী পীড়াপিড়ি করলে আর ভয় দেখালেই কনের বাপ টাকা বের করবার পথ পাবেন না। তখন যদি জানতুম যে, পুরন্দরও শ্রীকে দেখেই মন হারিয়ে বসে আছে, তাহলে বাবাকে কি আর সামান্য টাকার জন্যে অমন হ্যাঙ্গাম করতে দিতুম? অদৃষ্ট!

একসঙ্গে এত অপমান, এত দুঃখ মানুষ কখনো নীরবে হজম করতে পারে না! পুরন্দর আমার বাল্যবন্ধু—সত্যি-সত্যি তাকে আমি ভালোবাসতুমও! কিন্তু বন্ধু হয়েও সমাজে সে আমার মাথা হেঁট ক'রে দিয়েছে, শ্রীকে আমার উন্মুখ আলিঙ্গন থেকে কেড়ে নিয়েছে! আগে সে ছিল আমার অতি-বড় বন্ধু, এখন সে আমার অতি-বড় শত্রু! তাকে ক্ষমা করব না!

শ্রী গেছে—তার বদলে পেয়েছি আমি প্রভাকে। হ্যাঁ, প্রভা; প্রভা—যে প্রভা আমার শ্রী-হীন জীবনের শিখাকে আরো-বেশী নিষ্প্রভ করে দিয়েছে! এবারকার উদ্বাহ-বন্ধনে উপকরণের কোনই ত্রুটি হয়নি—নগদ পাঁচহাজার টাকা, গা-সাজানো গয়না, পুরুত, শালগ্রাম শিলা, মন্ত্র-পড়া—একেবারে সবদিকে নিখুঁত! কিন্তু আমি জানি, এ বিবাহ বিবাহই হ'ল না, বাবা সুধু এই সুযোগে তাঁর শূন্যগর্ভ ক্যাশবাক্স পূর্ণগর্ভ করে, চাবীটি সাবধানে তাঁর ট্যাকের মধ্যে গুঁজে রাখলেন মাত্র।

কিন্তু ট্যাকের চাবীটি ইহলোকেই ফেলে বাবাকে এখন পরলোকে প্রস্থান করতে হয়েছে।······বাবার সেই অনেক যত্নের ক্যাশবাক্স আজও আমি খুলিনি! ও-টাকার উপরে আমার একটা দারুণ ঘৃণা আছে! ঐ টাকার দিকে বেশী লোভ থাকার দরুণই ত বাবা আজ আমার এই সর্ব্বনাশটা করেছেন! জমুক, ও বাক্সের উপরে ধুলো জমুক! বাবার যদি দরদ বেশী হয় ত পরলোক থেকে এসে ওর ধুলো ঝেড়ে ময়লা মুছে দিয়ে যান না! ও বাক্স আমি স্পর্শ করব না।

প্রভা আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারে না। তার চোখ-মুখ দেখলে মনে হয়, আমাকে সে একটা গোলকধাঁধার মত ভাবে! এ-

গোলকধাঁধার মধ্যে তার ঢুক্‌বার মত শক্তি না থাক্‌লেও, এটুকু বুঝ্‌বার মত বুদ্ধি তার ছিল যে, আমি তাকে ভালোবাসি না।

একদিন সে মুখ ফুটে আমাকে বলেছিল, "ছাখ, বিয়ের আগে সখীদের মুখে স্বামীর কথা শুনতুম। তখন ভাব্‌তুম স্বামী কি সুখের জিনিষ! এখন দেখ্‌ছি সব মিছে কথা।"

বিছানায় শুয়ে আমি অপরাধ-তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই পড়্‌ছিলুম। পড়্‌তে-পড়্‌তেই বল্‌লুম, "তাদের মিছে কথা কি তোমার বোঝ্‌বার ভুল, এটা আগে ভেবে দেখ।"

প্রভা শুয়ে ছিল, উঠে বসে বল্‌লে, "আমারই বোঝ্‌বার ভুল যদি হয়, তাহলে এটা ঠিক যে, তাদের স্বামীর সঙ্গে আমার স্বামীর কিছুই মেলে না।"

—"তা হ'তে পারে।"

—"তা হ'তে পারে! কেন তা হবে? কি দোষ আমি করেছি? বল, চুপ করে' রইলে যে?"

আমি নীরবে বই পড়ে যেতে লাগ্‌লুম। স্ত্রীর কাছে সব-সময়ে সত্য কথা বলা নিরাপদ নয়। সুতরাং এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে আমি বল্লুম, "কেন প্রভা, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যা কর্ত্তব্য আমি ত তার কিছুই অবহেলা করি-নি! তোমাকে খেতে দিচ্ছি, পর্‌তে দিচ্ছি, তুমি যা চাও তাই পাও। এমন-কি, বাঙালী মেয়েদের কপালে যে স্বাধীনতা জোটে না, সেই দুর্লভ সৌভাগ্যের আস্বাদও তুমি পেয়েছ—তোমার পায়ে কয়েদখানার বেড়ীর বদলে আমি স্বাধীনতার মহাচিহ্ন পাদুকা দিয়েছি—তুমি যেখানে খুসি যেতে পার, যার সঙ্গে ইচ্ছে মিশতে পার। আরো কি তুমি চাও?"

প্রভা দুই চক্ষু কুঞ্চিত করে' বল্লে, "গায়ে গয়না, পরতে কাপড় আর খেতে ভাত পেলেই স্ত্রীর সব দুঃখ ঘুচে যায়? আর, যে স্বাধীনতার কথা তুমি বলছ, সে ত একটা দাসীরও আছে।"

আমি একটু বিরক্ত স্বরে বল্লুম, "এতেও যদি তোমার মন না ওঠে, আমি নাচার!"

—"নাচার! দেখ, আমি আর বিয়ের কনেও নই, মূর্খ, অবোধ স্ত্রীলোকও নই! আমি বেশ বুঝতে পারি, তুমি আমাকে ভালোবাসো না। —আমাকে ভাবো একটা গলগ্রহের মত। বল, এই যদি তোমার মনে ছিল, তবে আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন?"

আমি আস্তে আস্তে বিছানার উপরে উঠে বস্‌লুম। আমার মেজাজ ক্রমেই চড়ে উঠছিল। স্থির স্বরে বল্লুম, "শোন, আমি তোমাকে বিবাহ করিনি! আমার বাবা আমাকে পণ্যদ্রব্যের মত বাজারে বার করেছিলেন, আর তোমার বাবা টাকা খরচ করে আমাকে কিনে নিয়েছিলেন—এইমাত্র!"

অকস্মাৎ কবুল জবাব পেয়ে, অত্যন্ত উত্তেজনায় প্রভার মুখ রাঙা হয়ে উঠল! আমার কাছ থেকে এমন কথা শুন্‌বে বলে সে বোধহয় প্রস্তুত ছিল না! কিন্তু আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে সে বল্লে, "কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বার আগে তুমি তোমার বাবাকে বল্‌তে পার্‌তে ত?"—

—"পণ্যদ্রব্যের—যে বিক্রী হচ্ছে তার আবার মতামত কি? তবে, ক্রেতার মনের মত না হ'লে, সে জিনিষ ফিরিয়ে দিয়ে ঘরের টাকা ফের ঘরে নিয়ে যায় বটে! আমি যদি তোমার মনের মত না হই, তাহলে তুমিও তাই কর্‌তে পার! তোমার বাবার টাকা ঐ ক্যাশবাক্সে মজুৎ আছে;—তোমার টাকা তুমি নাও, আমাকে ফিরিয়ে দাও—মুক্তি দাও!"

এই বলে টেবিলের উপরে ক্যাশবাক্সটা যেখানে ছিল, সেইদিকে আমি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করলুম্।

ক্যাশবাক্সের দিকে নির্ণিমেষ চোখে তাকিয়ে প্রভা রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে, "এতদিন পরে তোমার মুখে এই কথা!"

আমি বল্লুম, "এতদিন পরে এই কথাই আমাকে বল্‌তে হ'ল—কারণ, তুমি নিতান্তই আমাকে বল্‌তে বাধ্য কর্‌লে! হ্যাঁ, তবে আরো ভালো করে' শোন, আজ যখন আমরা এতটা বেশী এগিয়ে পড়েছি, তখন এই-খানেই থেমে যাওয়া ঠিক নয়—আমাদের ভেতরকার সমস্ত লুকোচুরি আজ স্পষ্ট হয়ে যাক্।······তোমার সখীদের মুখে তুমি যে-সব স্বামীর গল্প শুনেছ, সত্যিই আমি তাদের কারুর মত নই—আমার প্রকৃতি একেবারে আলাদা,—একেবারে উল্টো! তাই আমার স্ত্রীকে—তোমাকে, আজ আমি স্পষ্টই বল্‌ছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি না! শুন্‌ছ?—আমি তোমাকে ভালোবাসি না!··· ···এ কথার পরে তুমিও যদি আমাকে না চাও, আমাকে ত্যাগ করে' চলে যাও—আমি তোমাকে একটুও বাধা দেব না। আর, আমি তোমাকে ভালোবাসি না জেনেও তুমি যদি আমাকে ত্যাগ না কর, তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আর যা কর্ত্তব্য আমি তা পালন কর্‌তে রাজি আছি,—কেবল, আমি তোমাকে ভালোবাস্‌তে পার্‌ব না! আমার যা বল্‌বার ছিল বল্লুম, এখন তুমি যা ভালো বোঝ, কর।"

প্রভা কোন উত্তর দিল না—তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের আলোটা ফস করে' নিবিয়ে দিলে! বোধহয় তার মুখের ভাব পাছে আমি দেখে ফেলি, সেই ভয়ে!

ঘর অন্ধকার এবং স্তব্ধ! তার মধ্যে প্রভার নিশ্বাসের শব্দ খুব স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল—আমার মনে হ'ল যেন, একটা ক্রুদ্ধ সর্পী রুদ্ধ আক্রোশে ক্রমাগত গর্জ্জন করছে!

প্রভাকে আমার মনের ভাব জানানো অত্যন্ত আবশ্যক ছিল; আজ তাই সুযোগ পেয়ে আমি সেটার সদ্ব্যবহার করলুম। সংসারের সমস্ত কাজের ভিড়ে শ্রীকে আমি একদিনও ভুলি-নি—এবং এও আমার সর্ব্বদা মনে আছে, আমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে! এতদিন আমি মনে-মনে মতলোব আঁটছিলুম—অনেক ভেবে-চিন্তে যে উপায় স্থির করেছি, তাতে ফল হয় কিনা, এইবার তা দেখবার সময় এসেছে।

প্রভাকে আমার কার্য্যোদ্ধারের একটা প্রধান উপকরণের মত ব্যবহার করব! আমি হচ্ছি ডাক্তার,—শুধু শরীর-বিজ্ঞান নয়, মনোবিজ্ঞানেরও কিছু-কিছু আমাদের জানতে হয়, নইলে আমাদের ব্যবসা চলে না। আমার কবুল জবাব প্রভার মনের উপরে কি-রকম কাজ করবে, সেটা আমি কতকটা বুঝতে পারছি। ভবিষ্যতের জন্যে আমি যে চক্রান্ত স্থির করেছি, প্রভা তা জানে না এবং আমিও তাকে জানতে দেব না। তবু, সম্পূর্ণ অন্ধের মত প্রভা যা করবে, খুব-সম্ভব তাতেই আমার কার্য্যোদ্ধারের কতকটা উপায় হবে। এখন দেখা যাক্, প্রভার চরিত্র সম্বন্ধে আমার যা অভিজ্ঞতা আছে তা ঠিক কিনা—সত্যসত্যই সে আমার পক্ষে না-হয়েও, আমাকে সাহায্য করে কিনা!

... ...

পুরন্দরের বাড়ীর ঠিক পাশেই আমি বাড়ী ভাড়া করেছি বলে সে ভারি খুসি হয়েছে। এতদিনের অদর্শনের পর আমার মত পুরানো বন্ধুকে

নিকট-প্রতিবেশী পেয়ে, সে অনেক আনন্দ প্রকাশ করলে। তার এই আনন্দ যে অকৃত্রিম, পুরন্দরের হাসি-মুখ দেখে আমি তা বেশ বুঝতে পারলুম। সে যে আমাকে ঘৃণা করে না, এটা বুঝে আমার বুক থেকে মস্ত-একটা বোঝা নেমে গেল।

বন্ধু পুরন্দর, বন্ধু পুরন্দর! খুব হাসো বন্ধু, খুব হাসো! হিসাব-নিকাশ হ'তে এখনো বিলম্ব আছে!

তিন

শ্রীর কথা

জ্বালাতন গো জ্বালাতন! এমন মুস্কিলেও মানুষে পড়ে বাপু! এত করে' বল্লুম—তোমার ঐ বিনোদ-টিনোদের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই না, তা কিছুতেই আমার কথা শুনলে না গা! সেই তাকে নিয়ে আসা হ'ল, তবে ওঁর মনের আশ মিটল! ভ্যালা জ্বালা যা-হোক্!

হ্যাঁ, বুঝতুম, বিনোদের দুটোর বদলে চারটে পা আছে, আর একটা ল্যাজ আছে, তাহলেও তার সঙ্গে দেখা-করার একটা বরং মানে পাওয়া যায়! তা নয়—নিয়ে এলেন কিনা একটা ধেড়ে-মিন্‌সে কাঠখোট্টা লোককে ধরে, ওকে ভাখবার জন্যে যেন আমার ঘুম হচ্ছিল না—পোড়া-কপাল আর কি!

সুধু আজকে বলে নয়, বিয়ের পর থেকে এম্‌নি কাণ্ড ত হামেসাই হচ্ছে! কী যে এক ঢং উঠেছে জানিনা—বাবুরা আমাদের আর বিবি না-বানিয়ে ছাড়বেন না! রামা-শ্যামা, যাদু-মাধু—ওঁর যত-রাজ্যের যত-সব

বন্ধু না মাথামুণ্ডুর দল আছেন, সকলকার সাম্‌নেই আমাকে বেরুতে হবে, মুখের ঘোম্‌টা খুল্‌তে হবে, কথা কইতেই হবে! কেন, এটা কি বাসাড়ে ধাড়ী, আর আমি কি মেসের দাসী-বাঁদী? প্রথম-প্রথম ভয়ে আমার বুক উড়ে যেত—শেষটা একটু-একটু করে' কতকটা অম্‌নি সইয়ে নিতে হয়েচে! না-সইয়ে কী আর করি বল, যে নাছোড়বান্দা ছিনে-জোঁকের হাতে পড়েছি!

কিন্তু বাইরে যতই আমি মুখ বুজে থাকি, মনে-মনে এ আমি কখনো বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌ব না—কখ্‌খনো না! হিঁদুর ঘরের মেয়ে আমি—আমার বাপের বাড়ীতে পিঁয়াজের গন্ধ পর্য্যন্ত কখনো ঢোকে-নি—আমা কি এ-সব মানায়, না ভালো দেখায়? যতটা রয়-সয় তার বেশী ভালো নয়—লেখাপড়া শিখ্‌তে বল, শিখছি; তোমার সঙ্গে যেখানে যেতে বল যাচ্ছি—কিন্তু তোমার ঐ মূর্ত্তিমান ভূতের দলের মাঝ্‌খানে গিয়ে বেহায়ার মত বস্‌লে আমার কি মোক্ষলাভ হবে বল!

আর বন্ধুগুলিও কি তেম্‌নি!—মাগো, এক-একটি চেহারা দেখ্‌লে গায়ে যেন কম্প দিয়ে জ্বর আসে! কোনটির গোঁফ-দাড়ী কামানো, মাকুন্দের মত দেখ্‌তে—সকালে চোখে পড়্‌লে অকল্যাণের ভয়ে নেয়ে মরতে হয়। কোনটির মুখে আবার ঝাঁটার মত গোঁফ আর রামছাগলের মত লম্বা দাড়ী—ঠিক একটি আস্ত বনমানুষ—চিঁড়িয়াখানার পিঁজ্‌রে ভেঙে পাঁচিল ডিঙিয়ে কোন্ ফাঁকে যেন পালিয়ে এসেছেন। কোনটির রং-গড়ন ঠিক মোষের মত, কপাল দিয়ে তেল, ঠোঁট দিয়ে পাণের রস গড়াচ্ছে আর হাপরের মত ভুঁড়িটি সর্ব্বদাই হাঁসফাঁস আর কি-খাই কি-খাই কর্‌ছে। এ জীবগুলি যে-সব ভাগ্যবতীর ঘর অন্ধকার করেছেন,

তাদের কি শক্ত দেখে শিকল কিন্‌বার পয়সা নেই? আমার অমন কার্ত্তিকের মত স্বামীর পাশে কি এই-সব কিম্ভূতকিমাকার নন্দীভৃঙ্গীকে দেখ্‌তে-শুন্‌তে মানায়, না ভালো দেখায়?……

মাঝে দিনকতক এক মেম-মাষ্টারণী এসে পেত্নীর মত আমাকে পেয়ে বসেছিল। বন্ধুগুলির কাছ থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলেও সে মাগীর হাত থেকে আর কিছুতেই ছাড়ান্ ছিল না। রাত্তিরে পড়াশুনো করে' রোজ রোজ নাইতে হ'ত—মেম ছুঁয়ে সে কাপড়ে থাক্‌তে গা ঘিন্‌ঘিন্ কর্‌ত। বছরখানেক যেতে-না-যেতেই বুকে সর্দ্দি জমে শক্ত অসুখে পড়্‌লুম। তখন ওঁর হুঁশ্ হ'ল, আমাকে খুব-খানিক বকে-ঝকে শেষটা মাষ্টারণীকে বিদায় করে' দিলেন, আমিও আঃ বলে হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচলুম।

এত যে বলি, তা উনি ত কিছুতেই বোঝ মান্‌বেন না! উনি বলেন, "মেয়েদের আমি অন্ধকূপে ডুবিয়ে রাখ্‌তে চাই না। তারাও যাতে আমাদের মত লেখাপড়া শেখে, আমাদের মত স্বাধীন হয়, সকল পুরুষেরই সেই চেষ্টা করা উচিত।"

আমি বলি, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি গো, যেমন আছি আমাকে তেম্‌নি থাক্‌তে দাও—সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো!"

—"সেকি শ্রী, স্বাধীনতার যে কত সুবিধে তা কি তুমি জান না!"

—"না আমি জানি না—জান্‌তেও চাই না। আমি সুধু তোমার পায়ের তলায় দাসী হয়ে থাক্‌তে চাই।"

—"পিঁজ্‌রেয় বন্ধ থেকে-থেকে পাখীর যেমন ডানা আড়ষ্ট হয়ে যায় —তোমারও দেখ্‌ছি সেই দশা হয়েছে! এখন খাঁচার দরজা খুলে দিলেও তুমি আর উড়্‌তে পার্‌বে না!"

—"কথার ছিরি দেখ! হ্যাঁ গা, ফাঁক্ পেলেই আমি যদি পাখীর মত ফুড়ুক্ করে' উড়ে পালাই, তাহলে তুমি কি খুব খুসি হও?"

—"এইজন্যেই তোমাকে ভালো করে' লেখাপড়া শিখ্‌তে বলি! লেখাপড়া শিখ্‌লে তুমি এমন অজ্ঞানের মত কথা বল্‌তে না—আমার কথার আসল অর্থ বুঝ্‌তে পার্‌তে!"

—"কেন, তোমার ঐ ছাইভস্ম ইংরিজী না পড়্‌লেই কি লেখাপড়া শেখা হয় না? আমি কি মুখ্যু? আমি কি মহাভারত, রামায়ণ আর ভালো ভালো বাঙ্‌লা বই পড়্‌তে পারি না?"

—"কিন্তু ও-সব পড়েও তোমার জ্ঞান হয়েছে এই যে, আমার কথার মানে পর্য্যন্ত তুমি বুঝ্‌তে পার না!"

—"তোমার ও স্বাধীনতা-ফাধিনতা মাথায় থাকুক্, আমার যেটুকু জ্ঞান হয়েছে তাই নিয়েই এ-জন্ম যেন কাটিয়ে দিতে পারি। তুমি স্বামী, দেবতার চেয়েও তোমাকে আমি বেশী ভক্তি কর্‌ব—এর চেয়ে বেশী জ্ঞান আমার আর চাই না! সুখে-দুঃখে একমনে তোমার সেবা কর্‌ব—এর চেয়ে বড় ধর্ম্ম আর নেই। হ্যাঁ গা, তোমার ঐ ইংরিজী বইগুলোতে কি এর চেয়েও ভালো জ্ঞানের কথা আছে?"

—"তা আছে বৈ কি! ইংরিজি পড়্‌লে তুমি জান্‌তে পার্‌বে—ভগবানের রাজ্যে সব মানুষই সমান—তা সে মেয়েই হোক্, আর পুরুষই হোক্। স্বামী স্ত্রী,—দুজনেই দুজনকে শ্রদ্ধা কর্‌বে, অন্যায় কর্‌লে দুজনকেই সমান ভাবে দোষী হ'তে হবে, ঘরে-বাইরে দুজনেরই সমান স্বাধীনতা থাক্‌বে।"

জান্‌লা দিয়ে রাস্তাটা দেখিয়ে আমি বল্লুম, "ঐ দেখ, একদল

একটা ফুটবল নিয়ে হৈচৈ কর্‌তে-কর্‌তে যাচ্ছে! আচ্ছা, আমি যদি এখন ওদের সঙ্গে যাই, তাহলে তুমি কিছু বল্‌বে না ত?"

স্বামী বল্লেন, "যদিও ওদের সঙ্গে যাবার সাহস তোমার হবে না, তবু জিজ্ঞাসা করি, ওদের সঙ্গে তুমি কোথা যেতে চাও?"

—"কেন, মাঠে!"

—"সেখানে গিয়ে কি কর্‌বে?"

—"ফুটবল খেল্‌ব।"

—"ফুটবল! ফুটবল খেল্‌বে?"

—"কাজেই। আমরাও যখন তোমাদেরই মত স্বাধীন, তখন—"

—"দেখ শ্রী, কোন কথাই যে তুমি গম্ভীর হয়ে শুন্‌তে পার না, তার কারণ কি, জান?"

—"না, তার কারণ আমি জানি না। তবে কারণ না জেনেও আমি খুব গম্ভীর হ'তে পারি। দেখ্‌বে? এই দেখ আমি গম্ভীর হলুম!"

স্বামী দুঃখিত ভাবে হেসে বল্লেন, "তোমার সঙ্গে পারা ভার! তুমি এম্‌নি গম্ভীর ভাবে বসে থাক, আমি এখন চল্লুম।"

আজ খাওয়া-দাওয়ার পর ঝোলে নুন্ দেয়-নি বলে উড়ে-বামুনটাকে যখন ধম্‌কাচ্ছিলুম, আর সে যখন আর কোন ওজর না পেয়ে আমাকে বোঝাতে চাইছিল যে, নুনটা বড্ড-বেশী সিদ্ধ হয়ে গলে-যাওয়ার দরুণই ঝোলটা আলুনি হয়েছে, তখন আর-একটি লোককে সঙ্গে করে' হঠাৎ আমার স্বামী একেবারে উপরে উঠে এলেন।

আমি পালাবার পথ না পেয়ে মুখে তাড়াতাড়ি ঘোম্‌টা টান্‌তে গেলুম, স্বামী

বলে উঠ্‌লেন, "আহা-হা, কর কি! ঘোম্‌টা টান্‌লে ও-ঘোম্‌টা আমি ফের খুলে দেব!"

কাজেই ঘোম্‌টা টানা আর হ'ল না, আমি জড়সড় হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম।

স্বামী বল্লেন,"বিনোদ, এই আমার স্ত্রী—শ্রী, এই আমার বন্ধু বিনোদ!

কেমন কৌতূহল হ'ল! মুখ তুলে লোকটির দিকে একবার তাকালুম—সেও আমার দিকে চাইলে। তার চোখদুটো যেন আগুনের মত,—চোখো-চোখি হ'তেই আমি মুখ নামিয়ে নিলুম।

স্বামী বল্লেন, "বিনোদ, আমার বিবাহে বল্‌তে গেলে তুমিই একরকম ঘটকালি করেছ, সেজন্যে তোমাকে আমরা দুজনে আজ একসঙ্গে ধন্যবাদ দিচ্ছি!"

বিনোদ দু-তিনবার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে' নিয়ে বল্লে, "তোমরা কিন্তু এম্‌নি অকৃতজ্ঞ যে, আজ-পর্য্যন্ত ঘটক বিদায় কর্‌তে সময় পাও-নি!"

—"কিন্তু বন্ধু, তোমার মত বিচিত্র ঘটককে আমরা বিদায় করে' দিতে ইচ্ছুক নই; কারণ সেটা সভ্যতাসঙ্গত হবে না। শ্রী, বিনোদের সঙ্গে কথা কও!"

কথা কইতে আমি পারলুম না।—যেমন ছিলুম, তেমনি দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু এটা বুঝতে পারলুম যে, বিনোদের চোখদুটো আমার মুখের উপরে অত্যন্ত স্থির হয়ে আছে!

স্বামী হাসতে হাসতে বল্লেন, "বিনোদ, আমার স্ত্রীটিকে তুমি যেন বোবা ঠাউরে নিও না। উনি এখন চুপ করে' আছেন বটে, কিন্তু আমাকে একলা পেলেই এখনি উনি ঠিক স্বদেশী বক্তাদের মত মুখর হয়ে উঠ্‌বেন

বিনোদ বল্লে, "তাহলে উনি প্রতিমার মত চুপ করেই থাকুন, আমিও নীরবে ওঁকে পূজা করি! রমণীর মুখে বক্তৃতা শুনলে আমার বুকের মধ্যে যেন কাঁপুনি আসে!"

—"বিনোদের কথা শুনলে ত শ্রী! অতএব সাবধান, আর কখনো বক্তৃতা দিও না!"

আমার যা রাগ হচ্ছিল! উনি কি আক্কেলের মাথা একেবারে খেয়েছেন—যার-তার সামনে আমাকে এমনি অপদস্থ করা! আর যেমন উনি, বন্ধুও কি জুটেছে তেমনি! কোথাকার কে তার ঠিক নেই, এসেই একেবারে আমার সঙ্গে ঠাট্টা জুড়ে দিয়েছে! আরে গেল যা!

বিনোদ বোধহয় আমার মনের ভাব বুঝতে পারলে। সে বল্লে, "আচ্ছা ঠাকরোণ, আজ নমস্কার করে' বিদায় হচ্ছি—প্রথম দিনেই আপনার মৌন-ব্রত আমি ভঙ্গ করতে চাই না—কারণ, অনেক সাধ্য-সাধনা না-করলে দেবী-প্রতিমাকে কথা কওয়ানো যায় না।"—এই বলে বিনোদ চলে গেল—আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

চার

প্রভার কথা

মাগো, এ ব্যর্থজীবনের বোঝা আর যে আমি বইতে পারি না! এই নিষ্ঠুর সংসারের মধ্যে, এই তুষানলের চিতায় পড়ে আর কতদিন আমাকে এমন করে' দণ্ডে দণ্ডে মরতে হবে? শৈশবে বড় সাধে যে আশার বাতি জ্বালিয়েছিলুম, যৌবনের প্রথমেই সে দীপ নির্ব্বাণ হয়েছে! আর কি

কখনো এ-জীবনে তার শিখা জ্বলবে,—আবার আমার সকল আঁধার আলো করে' ?

না, সে আশা নেই। আমার সকল আশার সাজানো প্রদীপ যে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে—সে ভাঙা দীপ আর ত জোড়া লাগ্‌বে না !

একটা কথা যখন-তখন মনে হয়, এই নারী-জীবন কিসের জীবন ? কেতাবে পড়েছি পণ্ডিতরা বলেন, পৃথিবীতে উন্নতি হয় যোগ্যতমের ; যে অযোগ্য, ছুনিয়ায় তার ঠাঁই নেই—সে ধ্বংস হয়ে যায়। এই নিয়ম নাকি বরাবর চলে আস্‌ছে—জগতের অতীত ইতিহাস অযোগ্যের অন্তিম নিঃশ্বাসে উত্তপ্ত ! অনেক বড়-বড় জীব, অনেক বড় বড় জাতি, জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতা ছিল না বলে চিরকালের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে, পৃথিবীর স্তরে-স্তরে আপনাদের পদচিহ্ন এঁকে রেখে। তাই যদি হয়, নারীজাতি তবে কি-করে' আজ পর্য্যন্ত সংসারে বর্ত্তমান আছে ? প্রবল পুরুষের কাছে দুর্ব্বল নারী ত প্রতিদিন প্রতিপদে পরাস্ত হচ্ছে ! প্রতিভায়, বিদ্যায়, ক্ষমতায় নারী ত কোথাও পুরুষকে হারাতে পারেনি ! বিশেষ, এই ভারতবর্ষে—না, বাঙ্‌লাদেশে, নারীর বুক যেখানে পুরুষের চল্‌বার রাস্তা, সেখানে এখনো আমরা বেঁচে আছি কোন্ কুহকে ? নিত্য যে এত অত্যাচার, এত অবিচার সহ্য কর্‌ছি, তবু ত আমরা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছি না !......না, হয়ত আমাদের প্রাণ বহুদিন লুপ্ত হয়ে গেছে, বেঁচে আছে সুধু আমাদের এই দেহটা—পুরুষ কৃত্রিম উপায়ে এই দেহটাকে জীইয়ে রেখেছে তার কাম-প্রবৃত্তি মেটাবার যন্ত্রের মত, তার পদসেবা করবার নিরাপদ উপায়ের মত। পুরুষের আবশ্যক, তাই আমাদের প্রাণহীন দেহ এখনো উঠ্‌ছে বস্‌ছে, চল্‌ছে ফির্‌ছে। যেদিন সে আবশ্যক থাক্‌বে না, আমাদের দেহকেও

সেদিন সংসারের বাইরে দূর করে' টেনে ফেলে দেওয়া হবে,—ভবিষ্যতের যাদুঘরে তখন অতীতের জীবন-সংগ্রামে মৃত অন্য-অনেক জীবের কঙ্কালের সঙ্গে আমাদেরও দেহাবশেষ দেখে, ভবিষ্যতের মানুষ তখন বল্‌বে, 'অতীতে নারী বলে এক অযোগ্য জাতি ছিল, পুরুষের সঙ্গে জীবন-সংগ্রামে তারা লুপ্ত হয়ে গেছে।'... ...

স্বামী সেদিন স্পষ্ট করেই বল্‌লেন, 'আমাকে তিনি ভালোবাসেন না!' পুরুষ এ-কথা অনায়াসেই স্ত্রীকে বলতে পারে—বল্‌লে কোন দোষ নেই! কিন্তু স্ত্রী যদি এম্‌নি অনায়াসে তার মত প্রকাশ করে, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা অত্যন্ত-নিকৃষ্ট কোন অপরাধের চেয়েও বেশী-অপকৃষ্ট হয়ে উঠবে। ......আমাদের দেহের স্বাধীনতা আর মনের স্বাধীনতা দুইই নষ্ট হয়ে গেছে—পুরুষের হাতে আমরা এখন এক-একজন এক-একটি যন্ত্রচালিত পুতুল-মাত্র।

এখন আমি কি করব?... ... যে স্বামী আমাকে ভালোবাসেন না,—সে স্বামীকে আমি ভালোবাসব কেমন করে? ভালো হোন্ মন্দ হোন্, স্বামীকে পূজা করতে হবে দেবতার মত,—আদর্শ-সতীরা এই মহৎ উপদেশ দিয়ে গেছেন। কিন্তু মন যখন বিদ্রোহী, তখনো কি-করে' যে বিমুখ স্বামীর পা-পূজা করা যায়, তা ত আমি কোনমতেই ভেবে পাচ্ছি না! শুনেছি, অনেকে শীতলাকে ভক্তি করে না—করে সুধু ভয়। আর ঐ দেবতাকে যে পূজা দেয়, তাও দেয় ভয়ে-ভয়ে। আমাকেও কি তাই করতে হবে? স্বামীকে পূজা করতে হবে ভয়ের দেবতার মত? আর সেই পূজায় যদি সিদ্ধ হই, তাহলে আমিও একজন প্রথমশ্রেণীর সতী হয়ে উঠ্‌ব ত?

না, না—আমি ভুলে যাচ্ছি যে, এ-সব হচ্ছে কেতাবের বানানো কথা! এ-সব কথার অর্থ না বুঝেই আমি মুখস্থ করে' যেতে পারি টিয়াপাখীর মত, কিন্তু তার সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ ত থাকবে না, তাতে ত আমার দেহ তৃপ্ত হবে না! আমার প্রাণ যে সচেতন—দেহ যে রক্ত-মাংসের!

জানিনা, যৌবনের ধর্ম্ম কি? কিন্তু আকাঙ্ক্ষা যদি যৌবনের ধর্ম্ম হয়, তবে সে আকাঙ্ক্ষা আমার ষোলআনাই আছে—আর তা অতৃপ্ত হয়েই আছে! প্রাণ আমার এখন বিশ্বের সকল ঐশ্বর্য্য, সকল সৌন্দর্য্য, সকল রূপ-রস-গন্ধ আর সকল হাসি-গান-আনন্দকে অমৃত-ধারার মত পান কর্বার জন্যে তৃষিত হয়ে আছে, উন্মুখ হয়ে আছে, কিন্তু নিয়তি আমাকে যে অন্ধকারে বন্ধ করে' রেখেছে—কে আমাকে সে অন্ধ-কারাগার থেকে মুক্তি দেবে, কে দেবে গো—কে দেবে?

সেদিন স্বামী যখন প্রকাশ্যে তাঁর মনের গোপন দিকটা আমাকে খুলে দেখালেন, তখন থেকেই আমারও চোখ খুলে গেছে। আমি যে তাঁর চোখের বালি, বিবাহের পর থেকেই এ সন্দেহ আমার বরাবর ছিল,—তবে সেটা সন্দেহ মাত্র। কিন্তু সেদিনকার স্পষ্টাস্পষ্টি কথার পর আর সন্দেহ কর্বার কিছু নেই।..... আমি ত কোন দোষ করি-নি! তবে কেন আমি তাঁর প্রেম থেকে বঞ্চিত হলুম?......কথাটা বারবার বুঝ্বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু একবারও বুঝ্তে পারি-নি!

এম্নি যখন মনের গতিক্, তখন হঠাৎ একদিন স্বামী তাঁর এক বাল্য-বন্ধুকে সঙ্গে করে' একবারে আমার ঘরে এসে ঢুক্লেন। আমি তখন স্বরলিপি দেখে হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি গান মুখস্থ কর্ছিলুম:—

—আমার একটি কথা,

বাঁশী জানে, বাঁশী জানে।—

পায়ের শব্দে চম্‌কে পিছন ফিরে দেখ্‌বামাত্রই, একসঙ্গে আমার গান আর বাজনা দুই থেমে গেল।

যিনি এসেছিলেন তিনি আমার স্বামীকে বল্লেন, "বিনোদ, ওঁর একটি কথা যখন বাঁশীই সুধু জানে, তখন সে কথা আমি জোর করে' শুন্‌তে চাই না। আমি এখন একটু নীচেয় গিয়ে বসি, ওঁর গান থাম্‌লে আমায় ডেকো।"

স্বামী বল্লেন, "যেওনা পুরন্দর, থামো! তুমি গান শুন্‌তে ভালোবাসো বলেই এখানে তোমাকে এনেছি।"

—"না বিনোদ, উনি আমার সাম্‌নে লজ্জায় গান গাইতে পারছেন না! আমি যাই।"

স্বামী হো হো করে' হেসে বল্লেন, "লজ্জা কিহে! তোমার স্ত্রীর মত প্রভাকেও আমি লজ্জাবতী লতা করে' রাখি-নি, তাকে আমি নিজের মনের মত করে' গড়ে তুলেছি। লজ্জাকে প্রভা একটা দুর্ব্বলতা বলেই মনে করে।"

স্বামীর কথাগুলো আমার কাণে অত্যন্ত বেসুরো লাগ্‌ছিল।

আগন্তুক বল্লেন, "উনি যদি লজ্জিত না-হয়েই থাকেন, তবে আমাকে দেখে গান বন্ধ কর্‌লেন কেন?"

—"প্রভা বোধহয় ভাব্‌ছে তুমি সমঝদার শ্রোতা নও! তা নয় গো, তা নয়, শুন্‌চ প্রভা? এ হচ্চে আমার বাল্যবন্ধু পুরন্দর, আমার মুখে এর কথা নিশ্চয়ই তুমি অনেকবার শুনেচ!"

আমি নমস্কার করে' বল্লুম, "বসুন পুরন্দরবাবু, দাঁড়িয়ে রৈলেন কেন?"

—"আপনার সঙ্গীত-সাধনাকে আমি বাধা দিতে ভয় পাচ্ছি। আপনি ফের গান সুরু না-করলে আমি ত আর নির্ভয় হ'তে পারব না!"

অগত্যা আমি আবার হারমোনিয়ামে সুর দিয়ে গান ধরলুম!

গান শেষ হ'লে স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন লাগ্‌ল পুরন্দর?"

পুরন্দরবাবু দুই চোখ বন্ধ করে' গান শুনছিলেন। স্বামীর কথায় চোখ খুলে বল্লেন, "আঃ! গানের সমস্ত মাধুর্য্য তোমার ঐ কর্কশ কণ্ঠস্বর একেবারে মাটি করে' দিলে!"

—"তা তো বুঝচি, কিন্তু প্রভার গান তোমার কেমন লাগল বল দেখি?"

—"চমৎকার! ওঁর গান শুনলে বনের পশুও বশ মানতে বাধ্য হবে!"

—"সত্যি?"

—"হ্যাঁ। এই দেখ না, আমার মত পাষণ্ডও ইতিমধ্যেই ওঁর একান্ত বশীভূত হয়ে পড়েচে।"

আমি বল্লুম, "পুরন্দরবাবু, গান গাইতে আমার লজ্জা হয় না, কিন্তু আমার সামনে বসেই কেউ যদি আমারি সম্বন্ধে এমন অত্যুক্তি করেন, তাহলে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়!"

পুরন্দরবাবু বল্লেন, "আপনি যদি ফের গান ধরেন,—তাহলে আমি অত্যুক্তি, চুলোয় যাক্—সামান্য-উক্তি পর্য্যন্তও করব না!—আমি যে আপনার বশীভূত হয়ে পড়েচি, তাহলে আপনি সেটা বিশ্বাস করবেন ত?"

স্বামী এতক্ষণ খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি মুখ তুলে বল্লেন, "এত-অল্পে বিকিয়ে যেও না পুরন্দর! প্রভা তাহলে ভাব্‌তে পারে তুমি সস্তার মাল—খেলো জিনিষ!"

—"না বিনোদ, সস্তা মালের খদ্দের যে বেশী! আপনাকে আমি দুর্লভ করে' রাখতে চাই না! প্রথম ডাকেই যারা বিকিয়ে যেতে পারে, জগতে তাদের চেয়ে সুখী আর কে আছে?"

—"তারা সুখী হয়ে ভুল করে। সুলভের দিকে কেউ চেয়েও দেখে না—কারণ, সকলের দৃষ্টি দুর্লভকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকে। দেখ, যে ঘাসকে আমরা দু-পায়ে থেৎলে যাই, সেই ঘাসের ভেতর থেকেও আদর করে দূর্ব্বাঘাস বেছে নিয়ে আমরা দেবপূজায় সমর্পণ করি। দুর্লভ বলেই দূর্ব্বার আদর।"

—"কিন্তু অতি-দুর্লভ নিন্দার পাত্র।"

—"প্রমাণ?"

—"শৃগাল ও দ্রাক্ষালতার গল্প মনে কর।"

—"কিন্তু সে ত অক্ষম দুর্ব্বলের কান্না! দুর্ব্বলের স্তুতি-নিন্দা আমি গ্রাহ্য করি না!"

—"বিনোদ, দুর্ব্বলের পক্ষ থেকেও অনেক বল্‌বার কথা আছে। কিন্তু কথায় সুধু কথা বেড়ে যাচ্ছে, অতএব আজ আর আমি দুর্ব্বলের পক্ষ সমর্থন করব না!"

—"হ্যাঁ, তার চেয়ে তুমি নিজের পক্ষ সমর্থন কর। প্রভাকে বুঝিয়ে দাও যে, সুলভ হ'লেও তুমি খেলো মাল নও!"

—"তোমার কথার মানে?"

—"অর্থাৎ, তুমিও একটা গান গাও। তুমি যে ভালো গাইতে পারো, প্রভা বোধহয় তা জানে না।"

আমি খুসি হয়ে বল্লুম, "পুরন্দরবাবু গান গাইতে জানেন বুঝি?"

পুরন্দরবাবু মুখ টিপে একটুখানি হেসে বল্লেন, "গান গাইতে আর কাঁদতে জানে না কে? বৈষ্ণবরাও কীর্ত্তন করে, ছুঁচোও কীর্ত্তন করে; মানুষেও গান গায়, গাধাও সুবিধে পেলে ইতস্তত করে না।"

—"না প্রভা, ওর ও-কথা শুন না! পুরন্দর একজন রীতিমত 'ওস্তাদ!"

আমি পুরন্দরবাবুর সাম্‌নে গিয়ে বল্লুম, "আপনি দয়া করে' একটি গান শোনান্—নৈলে এই প্রথম পরিচয়ের দিনেই আপনার সঙ্গে আমি আড়ি করে' দেব!"

—"না, না, সুন্দরীর সঙ্গে আড়াআড়ি করে' আমি আমার জীবনকে অসুন্দর করে' তুল্‌তে চাই না! কোকিলের লতাকুঞ্জে ভেকের মকধ্বনি শুন্‌তে আপনার যখন এতই আগ্রহ, তখন আমারও আর আপত্তি কর্‌বার কিছু নেই!"

এই বলে পুরন্দরবাবু উঠে হারমোনিয়ামের সুমুখে গিয়ে বস্‌লেন।

তারপর তিনি যা গাইলেন, তা অপূর্ব্ব! তেমন গান জীবনে কখনো শুনি-নি, কণ্ঠস্বরের উপরে মানুষের যে এতটা দখল থাকৃতে পারে, এঁর গান না-শুন্‌লে আমি তা বিশ্বাস কর্‌তুম না! না-জেনে এঁর সাম্‌নেই এইমাত্র আমি গান গেয়েছি বলে' আমার এম্‌নি লজ্জা কর্‌তে লাগ্‌ল!

গান থাম্‌লে পর আমি খানিকক্ষণ অভিভূত হয়ে বসে রইলুম—সুরগুলো যেন ঢেউয়ের মত তখনো আমার কানের উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল!

স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন শুন্‌লে প্রভা ?"

আমি মুগ্ধ স্বরে বল্লুম, "যা শুন্‌লুম, তা আর কখনো শুনি-নি! এমন গলাকে উনি লুকিয়ে রাখ্‌তে চাইছিলেন!"

পুরন্দরবাবু বল্লেন, "আমাদের গলা অনেক শিক্ষায়, অনেক চেষ্টায় তৈরি,—মেয়েদের মত আমাদের গলার আওয়াজ অমন মিষ্টি, অমন স্বাভাবিক নয়—এই জন্যেই বোধহয় সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সিংহাসন পুরুষকে দেওয়া হয়-নি! ওস্তাদরা নজির দেখিয়ে যতই জাঁক করুন, আমার মতে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের কণ্ঠ ঢের-বেশী মধুর! তাইত আমি আপনার কাছে গান গাইতে চাইছিলুম না!"

আমি বল্লুম, "ও-সব বিনয়ের কথা এখন থাক্! আপনার পায়ের তলায় বসে সারা জন্ম ধরে' শিক্ষা কর্‌লেও অমন গান আমি গাইতে পার্‌ব না!"

স্বামী বল্লেন, "দেখ পুরন্দর, তুমি যদি প্রভাকে গান শেখাও, তাহলে বড় ভালো হয়।"

পুরন্দরবাবু সঙ্কুচিত স্বরে বল্লেন, "মাপ কর ভাই, আমার নিজের শিক্ষাই এখনো সম্পূর্ণ হয়-নি, শিক্ষকের আসনে বস্‌বার যোগ্যতা আমার নেই!"

আমি বল্লুম, "আপনার অসীম বিনয়কে ধন্যবাদ পুরন্দরবাবু। তার চেয়ে স্পষ্ট বলুন না কেন, আমাকে শিক্ষা দিতে আপনার আপত্তি আছে!"

—"আপত্তি! না, আপত্তি আবার কিসের ?"

স্বামী বল্লেন, "ব্যস্, তাহলে এই কথাই পাকা হয়ে রৈল যে, কাল থেকে তুমি প্রভার সঙ্গীত-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করবে ?"

—"আমাকে জোর করে' গুরু করে' দেওয়া হোলো? এটা ভারি অন্যায় হোলো কিন্তু!"

এম্‌নি আর-দু-চারটে কথাবার্ত্তার পর পুরন্দরবাবু চলে গেলেন।

স্বামী আমাকে বল্লেন, "আমার বন্ধুটিকে কেমন লাগ্‌ল?"

—"বেশ। তোমার মত নীরস লোকের এমন সরস বন্ধু হোলো কি-করে'?"

—"সুধু সরস নয়, পুরন্দর কি সুন্দর পুরুষ দেখলে ত? বাঙালীর অমন সুশ্রী চেহারা সহজে চোখে পড়ে না।"

—"শুনেচি উনি যেমন বিদ্বান তেমনি ধনবান! ভগবান দেখচি ওঁকে খুব সুখী করে' পৃথিবীতে পাঠিয়েচেন!"

—"হ্যাঁ, পুরন্দরকে তুমি যদি হঠাৎ ভালোবেসে ফেল, আমি তাতে আশ্চর্য্য হব না!"

—"কি বলচ? ছিঃ!"

—"বলচি পুরন্দরকে তুমি ভালোবাস্‌লে আমি আশ্চর্য্যও হব না, দুঃখিতও হব না।"

বিস্মিত হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকালুম,—গম্ভীর হয়ে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে, তিনি বসেছিলেন! উনি ঠাট্টা করছেন, না, আমার মন পরখ করছেন?—কিছুই বুঝলুম না!

কিন্তু একটা বিষয় আমার নজর এড়ায়-নি! যতক্ষণ পুরন্দরবাবু এখানে ছিলেন, ততক্ষণ উনি যেন একেবারে নূতন মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। ওঁর অমন প্রসন্ন মুখ, অমন খোলাখুলি ভাব, আমাকে গান শেখাবার জন্যে এত-বেশী আগ্রহ,—এ-সবই আমার কেমন যেন

খাপ্ছাড়া বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু পুরন্দরবাবু চলে-যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর মুখ আবার যে-কে-সেই হয়ে দাঁড়াল,—এতক্ষণ উনি যেন একটা মুখোস পরে ছিলেন!

আমার মনটা ছাঁৎ-ছাঁৎ করতে লাগল! অস্বাভাবিক কিছু দেখ্লেই মানুষের প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে! উনি কি মনে-মনে কিছু মৎলোব্ এঁটেছেন?

আমার এই স্বামীটিকে আমি ভয় করি। সংসারের কোন মানুষই ওঁকে ভালো করে চিন্তে পারবে না—ওঁর চরিত্র ঠিক গোলোকধাঁধার মত; তার ভেতরে ঢুকতে গেলে নিজেকে হারিয়ে ফেল্তে হয়। ওঁর ভাবভঙ্গি, কথাবার্ত্তা, মতামত সব অদ্ভুত। আর পাঁচজনে যে পথে চলে, প্রাণ গেলেও উনি সে পথে চল্বেন না। সকলের কাছে যেটা উল্টো, ওঁর কাছে সেইটে সোজা। এমন মানুষকে কেউ ভালোবাসতে চায়ও না—বাসতে গেলে পারেও না। আগাগোড়া যার ছন্দপতন, তাকে জীবনের সঙ্গী করা কত কঠিন!

এই-যে আজ যে কথাটা উনি আমাকে বল্লেন, স্ত্রীর মুখের উপরে আর-কোন স্বামী কি তা বল্তে পার্তেন? আশ্চর্য্য! স্ত্রী যদি সত্যি-সত্যিই পরপুরুষকে ভালোবাসে, স্বামী তাহলে দুঃখিত হবেন না! এমন কথা যে বল্তে পারে, নিশ্চয়ই তার বুকের ভিতরে মানুষের প্রাণ নেই। —কিন্তু এ-কথাটা উনি কেন বল্লেন? আমি যা একবারও ভাবিনি, উনি তাই ভাবছেন কেন? পুরন্দরবাবু সুপুরুষ বলে' উনি কি ইঙ্গিতে আমাকে সাবধান করে' দিলেন?

স্বামীর মুখের দিকে আর-একবার চেয়ে দেখলুম। তেম্নি গম্ভীর ভাবে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে', তখনো তিনি বসে আছেন।

একটা চড়ুইপাখীর উপরে লাফ মেরে পড়বার জন্যে একবার একটা বিড়াল ওৎ পেতে বসেছিল। সে-সময়ে বিড়ালটার চোখের ভাব আমি লক্ষ্য করেছিলুম।

মনে হ'ল, আমার স্বামীর চোখের ভাব অনেকটা সেই বিড়ালেরই মত!......

পাঁচ

পুরন্দরের কথা

বিনোদের স্ত্রীটি বাস্তবিকই খুব শিক্ষিতা। লেখা-পড়া, গান-বাজনা, ছবি-আঁকা থেকে সুরু করে' ঘরকন্নার সমস্ত কাজ-কর্ম্মেই তার রীতিমত দখল আছে। লোকজনের সঙ্গে কথা-বার্ত্তাতেও তার পটুতা পুরুষের চেয়ে কম নয়। বাঙালীর ঘরের কুণো মেয়েদের মত অকারণ অশোভন লজ্জার ভারেও সে ভেঙে পড়ে না, তার ভাবভঙ্গিও যতদূর সচেতন হ'তে হয়! অর্থাৎ, 'পথে নারী বিবর্জ্জিতা',—নারীজাতির পক্ষে অপমানকর এই প্রবাদবাক্যটি প্রভার সম্বন্ধে একবারে খাটে না, জগতের বিপুল রাজপথে সে অনায়াসেই স্বামীর সহগামিনী হ'তে পারবে!

এই মাস-তিনেকের মধ্যেই প্রভা আমার কাছে নিকট-আত্মীয়ের মত পরিচিত হয়ে পড়েছে। তাকে নাম ধরে না-ডাকলে আমার ওপর সে রাগ করে, আর 'তুমি' ছেড়ে 'আপনি' বললে, সে ত আমার সঙ্গে কথা-কওয়াই বন্ধ করে' দিতে উদ্যত হয়!

রোজ সন্ধ্যার সময়ে তাকে গান শেখাতে যেতে হয়—এতে আর

কামাই কর্‌বার যো নেই! সে নিজে অনেকরকম নূতন খাবার তৈরি কর্‌তে পারে, প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করে' খাওয়ায়। আপত্তি কর্‌লে হেসে বলে, 'এ হচ্ছে আমার গুরুদক্ষিণা।'

কিন্তু প্রভার মনের ভিতরে কোথাও যেন খানিকটা ফাঁক্ আছে! হাসি-গল্পের মাঝখানে থেকে-থেকে সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ে, তার মুখখানি যেন কেমন ম্রিয়মান হয়ে আসে। চাঁদের উপর দিয়ে স্বচ্ছ হাল্‌কা মেঘ ভেসে গেলে যেমন দেখায়, প্রভাকেও তখন অনেকটা তেম্‌নিধারা দেখতে হয়। এর কারণ কিছু বুঝি না। প্রভা কি কোন গোপন দুঃখে কাতর হয়ে আছে? কিসের দুঃখ? মাঝে-মাঝে কথাটা তাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়! কিন্তু পাছে আমার কৌতূহলকে সে অন্যায় ভেবে বসে, সেই ভয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌তেও পারি না।

এদিকে শ্রী কিন্তু ভারি বেঁকে বসেছে! প্রভার সঙ্গে আমি মেলা-মেশা করি, এতেই তার এত রাগ! সে যখন-তখন এসে বলে, "অতবড় ধেড়ে মেয়েকে তুমি গান শেখাবে কেন?"

—"কেনই-বা শেখাব না, আগে তুমি তার কারণ দেখাও।"

—"আমার ভয় করে।"

—"ভয়। ভয় আবার কিসের? প্রভা কি আমাকে খেয়ে ফেল্‌বে?"

—"খেয়ে ফেল্‌তে পারে। ভালো জিনিষ সকলেই খেতে চায়।"

—"শ্রী, চিরকালই কি তোমার একরকমে যাবে? খালি স্বামীকে সন্দেহ! ছিঃ।"

—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, হ'তে যদি মেয়েমানুষ, আর বিয়ে করতে যদি তোমারি মত দুষ্টু একটি পুরুষকে, তাহলে টের পেতে মজাটা! হে মা

কাদি, হে মা দুর্গা! আস্‌চে-জন্মে আমার এই স্বামীটি খুব যেন কালো-কুৎসিত হন।"

—"তাতে তোমার লাভ-লোকসান কি? আস্‌চে জন্মে তোমার সঙ্গে আমার দেখা ত আর হবে না?"

শ্রী আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বল্‌লে, "ইস্‌ দেখা হবে না বৈকি! জন্মে-জন্মে তুমিই আমার স্বামী, জন্মে-জন্মে তোমার সঙ্গে দেখা হতেই হবে। আর, তখন যদি তুমি বেশ কালো-কুৎসিতটি হও, তাহলে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচব। তুমি ছাই-দেখতে হ'লে পোড়ারমুখীরা আর তোমার ওপরে নজর দেবে না।"

—"যে বেচারীদের তুমি পোড়ারমুখী বল্‌চ, তুমি নিজে যে আমার ওপরে তাদের চাইতে ঢের-বেশী নজর দিচ্ছ শ্রী। মাঝে-মাঝে দয়া করে' আমাকে তোমার নজরের আড়ালে যেতে দিও, নৈলে প্রাণ ত আর বাঁচে না। এক-একজন মেয়ের যেমন শুচিবাই থাকে, তোমার এই সন্দেহটাও ঠিক তেম্‌নি করে' তোমাকে পেয়ে বসেচে, এ বাই আর সার্‌বে না দেখচি।"

শ্রী কাঁদো-কাঁদো হয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, "বেশ, বেশ, যত দোষ আমার,—তুমি ভারি লক্ষ্মীটি কিনা, কিচ্ছু জান না। এই যে ও-বাড়ীতে বিনোদবাবুর বৌ এসেচে, দুদিন আগে যাকে তুমি চিন্‌তেই না, আজ তুমি তার সঙ্গেই দিন-রাত বসে বসে গল্প কর্‌চ, গান গাইচ—এটা দেখতে শুন্‌তে কি-রকম বল দেখি? সন্দেহ কি সাধে হয়? তার চেয়ে আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, চোখের ওপরে এ-সব আমি দেখতে পারব না!"

—"বেশ ত, তোমার যদি বাপের বাড়ীতে যেতে এতই ইচ্ছে হয়ে থাকে, তবে দু-দিন না-হয় সেখানে বেড়িয়েই এস না। আমার তাতে আপত্তি নেই।"

—"ও, বুঝেচি! আমি বাপের বাড়ী গেলে তোমার খুব সুবিধে হয়, —না? মনের সাধে যা-খুসি করে' বেড়াতে পার? হ্যাঁ, বাপের বাড়ীতে যাচ্ছি বৈকি, কখ্খনো ত যাব না, আমি এইখানেই জোঁকের মত মাটি কাম্ড়ে প'ড়ে থাক্‌ব—সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো!"—

—"আচ্ছা শ্রী, এই যে আজকাল বিনোদ রোজ আমাদের বাড়ীতে আস্‌চে, তুমিও ত একলা তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও, কৈ, আমি ত সেজন্যে তোমাকে কিছু বলি না! তবে আমার পেছনে তুমি লাগ কেন?"

—"তুমি বল্‌বে কোন্ মুখে! বিনোদবাবুর সঙ্গে আমাকে কথা কওয়ালে কে মশাই? সে ত তুমিই! একটা লোক যদি রোজ বাড়ীর ভেতরে এসে আমার সাম্‌নে তীর্থের কাকের মত বসে থাকে, আমার হাতের রান্না খাবে বলে' খোকার মত আব্‌দার করে, আমাকে বৌদিদি বলে' ডাকে, আমার অসুখের সময়ে প্রাণ দিয়ে চিকিৎসা করে, তাহলে তার সঙ্গে কথা না-কয়ে আর কর্‌ব কি? ধরেভদ্রে নিজেই যা ঘটিয়েচ, তার জন্যে আবার আমাকে দোষ দিতে লজ্জা কর্‌বে না তোমার?"

—"না শ্রী না, তোমাকে আমি দোষ দেব কেন? কথা কও, বেশ কর! আমি ত এই চাই!"

—"যা হয়েচে তা হয়েচে! তা-বলে তুমি ভেবনা যেন তোমার সমস্ত বন্ধুর পল্টনটি এসে যখন আমাকে আক্রমণ কর্‌বে, আমি তখন রণে ভঙ্গ

দেব না। না, আর কারুর সঙ্গে আমি কথা কইব না!"—এই বলে' শ্রী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাস্তবিক, বিনোদের বাহাদুরি আছে! শ্রীকে সে কথা কইয়ে তবে ছেড়েছে! আমি ভেবেছিলুম শ্রীর লজ্জা দূর করা অসম্ভব। কিন্তু সেই অসম্ভবকে সে সম্ভব করেছে।

আর, শ্রীর অসুখের সময়ে সে যে-রকম করে' খেটেছে, তা আর বল্‌বার নয়। অসুখটা খুবই শক্ত হ'য়ে উঠেছিল, বিনোদের চিকিৎসা আর শুশ্রূষার গুণেই সেটা আর বেশী সাংঘাতিক হ'তে পারে-নি। ডাক্তারীতে বিনোদের মাথা আছে।

বিনোদের অন্য-কোন দোষ আমি দেখ্‌তে পাই না, কিন্তু মাঝে-মাঝে সে যে-সব উদ্ভট মতপ্রকাশ করে, সেগুলাতে আমার পক্ষে সায় দেওয়া ভারি শক্ত। সব-তাতেই ওযে অসাধারণ হ'তে চায়, ঐটে ওর মহা দোষ। পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপারেই সীমা বলে একটা কিছু আছে, বিনোদ সেই সীমাকে মানে না।

এই সেদিন সকালে চা খেতে-খেতে আমি খবরের কাগজ পড়ছিলুম। একটা লোক বিষয়ের লোভে একসঙ্গে দুটি নরহত্যা করেছে! বিনোদ আমার সাম্‌নেই বসেছিল। খবরটা তাকে শুনিয়ে বল্লুম, "লোকটা কি পাষণ্ড দেখেচ!"

বিনোদ খানিকক্ষণ কিছুই বল্‌লে না। তারপর কয়েক চুমুকে চায়ের পেয়ালাটি নিঃশেষ করে বল্‌লে, "খুনীকে তুমি নিষ্ঠুর ছাড়া আর কিছু বলতে রাজি নও?"

—"নিশ্চয়ই নই।"

—"আমি কিন্তু খুনীকে বুদ্ধিমান্ বল্‌ব, যদি সে খুনের কোন সঙ্গত কারণ দেখাতে পারে।"

—"সঙ্গত কারণ মানে ?"

—"ধর, কেউ যদি আত্মরক্ষার জন্যে খুন কর্‌তে বাধ্য হয়, তুমি তাকে কি বল্‌বে ?"

—"আত্মরক্ষার জন্যে বাধ্য হয়ে হত্যা করা, আর বিষয়ের লোভে স্বেচ্ছায় হত্যা করা, এক কথা নয়।"

—"বিষয়ের লোভে হত্যা করাও আত্মরক্ষা হ'তে পারে। যে লোকটা দুটো খুন করেচে বল্‌চ, সেও হয়ত খেতে না পেয়ে মর-মর হয়েছিল। নিজে বাঁচবার জন্যেই সে খুন করেচে।"

—"আচ্ছা, আমি না হয় তোমার মতই সমর্থন করলুম। কিন্তু তাহলেও দেখচি, এ লোকটা নিজে বাঁচবার জন্যে আরো দু-জন লোককে বাঁচিবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত কর্‌লে। এখানে ত তোমার যুক্তি খাটচে না।"

—"অযোগ্য, দুর্ব্বল জীবন-সংগ্রামে বাঁচতে পারে না—এটা যে বিশ্বের ধারা। এখানে হত্যাকারী হত্যা করে' আত্মরক্ষা করেচে, আর হত লোক-দুটি অযোগ্য বলে' আত্মরক্ষায় অক্ষম হয়ে যোগ্যতমের পথ থেকে সরে' গেছে।"

—"কিন্তু হত্যার দ্বারা আত্মরক্ষা করে' সবাই যদি স্বার্থরক্ষা কর্‌তে চায়, তাহলে সভ্য-সমাজ বল্‌তে কসাইখানা ছাড়া আর কিছু বোঝাবে না।"

—"পুরন্দর, সভ্য-সমাজে কি চোখের উপরে নিয়তই নরহত্যা আর দুর্ব্বল-দলন চল্‌চে না ? ছোট করে' দেখ্‌লে সব জিনিষই ছোট দেখায়।

কিন্তু 'ম্যাগনিফাইং গ্ল্যাস' দিয়ে যাকেই তুমি বড় করে' দেখ্‌বে, দেখতে পাবে ভিতরে-ভিতরে তার কত অদেখা ব্যাপার লুকনো আছে! পৃথিবীতে যতরকমে যত লোক ধনী হয়েচে, তাদের লক্ষ-লক্ষ টাকা কি লক্ষ লক্ষ গরিব দুর্ব্বল লোকের দীর্ঘশ্বাস জমাট্ করে' তৈরি নয়? তাদের অধীনে কত কুলি-মজুর, কত কেরাণী, কত লোকজন যৎসামান্য মাহিনায়, পয়সার অভাবে অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে' রোগে ভুগে উচিতমত সাহায্য না পেয়ে, দিনে দিনে তিলে তিলে বুকের রক্ত দিয়ে খেটে-খেটে, ক্রমেই কি অকাল-মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চল্‌চে না? লক্ষপতির নিশ্চিন্ত দৃষ্টির সাম্‌নেই, পথের ধূলায়, তাঁর বাড়ীর ছায়ায় শুয়ে, রোগজীর্ণ অনাহার-শীর্ণ ভিখারী যখন অসহায় মৃত্যু-যন্ত্রণায় অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তখন কি তুমি তাকে হত্যাকারী বল্‌বে না? বিচারক যখন চোরকে পাঁচবৎসরের জন্যে কারাবাসের হুকুম দেন, আর চোরের মাতৃহীন শিশু পুত্র-কন্যারা না-খেয়ে একে-একে মর্‌তে থাকে, তখন কি নরহত্যা করা হয় না? ডাক্তার যখন ভিজিটের টাকা পাবেন না বলে সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত গরিব রোগীর চিকিৎসা-ভার গ্রহণ করেন না, তখন তুমি তাকে খুনী ছাড়া আর কিছু বল্‌তে পার কি? এই যে তোমার-আমার উদর-পূর্ত্তির জন্যে নিত্য মৎস্য-মাংসের প্রয়োজন হচ্চে, এও কি হত্যার ফলে নয়? ধনী, দরিদ্র, মানুষ, পশু—সকলের মধ্যেই ত একই প্রাণের ধারা বয়ে চলেচে! বাঁচ্‌বার আনন্দের কথাই যদি বল, তাহলে কারুকেই আমরা সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত কর্‌তে পারি না!"

—"বিনোদ, একটা সামান্য খুনীর কথা থেকে এত-বড় একটা দার্শনিক সমস্যা আনা তিলকে তাল করা মাত্র।"

—"না, তোমার ঐ হত্যাকারীকে আমি সামান্ত লোক মনে করি না তোমাদের সকলকার মত ও-লোকটি একই স্রোতে গা-ভাসান্ দেয়-নি ও স্রোতের বিরুদ্ধে নূতন একপথে যেতে চেয়েছিল,—ওকে আমি অসামান্ত বলি, ওকে আমি শ্রদ্ধা করি।"

—"তুমি যদি বিচারক হ'তে, তাহলে ওর কি ব্যবস্থা কর্‌তে?"

—"বেকসুর খালাস। আমি শাস্তি দিতুম তাদের, খুনের যার কোন কারণ দেখাতে পার্‌ত না!"

—"বিনোদ, তুমি ভয়ানক লোক।"

—"না, আমি অসাধারণ লোক! কারণ, আমার স্বার্থে যদি কেউ বাধা দেয়, আমি নিজে তাহলে তাকে খুন কর্‌তে পিছপাও হব না।"

বিনোদের মাথায় নিশ্চয় পাগলামির ছিট্ আছে। নইলে এমন কথাও বলে!

ছয়

বিনোদের কথা

অনেক কষ্টে শ্রীকে বশ করেছি। সে যদি প্রভার মত লেখাপড়া জান্‌ত, তা'হলে তাকে বাগে আন্‌তে আমাকে এত-বেশী বেগ পেতে হ'ত না; কিন্তু শ্রীর মত মেয়েরা সংস্কারের মায়ায় অন্ধ আর আচ্ছন্ন হয়ে থাকে,—যুক্তির ধার দিয়েও তারা যেতে চায় না। তাদের মন-ফেরানো তাই বড় কঠিন।

প্রভা ভাবে, আমার মধ্যে সরসতা কি কোমলতা একটুও নেই।

তাকে আমি একদিনও আদর করি-নি, একদিনও প্রাণ খুলে তার সঙ্গে আমি মিশি-নি, আমার মনের ভিতরটা তাই তার চোখের আড়ালেই থেকে গেছে। আমি যে মিষ্টি কথা কইতে পারি, আমার বুকেও যে আবেগ আছে, প্রেম আছে, প্রভা তা কল্পনা কর্‌তেও পারে না। কিন্তু সে যদি আমাকে একদিন শ্রীর সঙ্গে দেখে, তা'হলে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে; কারণ এত সাবধানে থেকেও শ্রীর সাম্‌নে এলে, আমার প্রাণের ছদ্মবেশ মাঝে মাঝে দক্ষিণে হাওয়ায় পরচুলের দাড়ি-গোঁফের মত খুলে পড়ে যায়। প্রভার দৃষ্টি যে-রকম তীক্ষ্ণ, তার বুদ্ধি যে-রকম ধারালো, তাতে শ্রীর সঙ্গে আমায় দেখলে সে হয়ত কিছু সন্দেহ কর্‌তে পারে; এই ভয়েই তাকে আমি মানা করেছি, শ্রীর সঙ্গে আলাপ কর্‌তে।

আমার চিকিৎসায় শ্রীর অসুখ সেরেছে বলে পুরন্দর আমাকে ভারি তারিফ কর্‌ছে। তার বিশ্বাস, শ্রীর অসুখটা খুবই কঠিন হয়েছিল। তার এই বিশ্বাসে মনটা আমার চাপা হাসিতে ভরে যায়। গাড়ল! অসুখটা খুবই কঠিন হয়েছিল বটে! কিন্তু সহজ অসুখকে যে ডাক্তারেরা অনায়াসেই স্বেচ্ছায় কঠিন ক'রে তুলতে পারে, পুরন্দর ত সে খোঁজ রাখে না! হ্যাঁ, শ্রীকে আমি ঋণী কর্‌তে চাই আমার কাছে। সে বুঝুক, আমি তার পরম-উপকারী বন্ধু। আমি যে ধীরে-ধীরে চারিদিক ঘিরে মাকড়সার জাল রচনা করে' তুলছি, এরা স্বামী-স্ত্রী কেউ তা দেখতে পাচ্ছে না। একবার এই জালের ভিতরে ধরা পড়্‌লে, কি করে এরা আর বাহিরে বেরোয়, সে আমি তখন দেখে নেব।

শ্রীর অসুখের সময়ে তার বিছানার পাশে বসে থাক্‌তে-থাক্‌তে, একটি বিষয় আমি আবিষ্কার করেছি। সেদিন শ্রী পাশ ফিরে শুয়ে আছে, পুরন্দর

আর আমি বসে-বসে কথা কইছি, এমনসময় আমার বাড়ীর চাকর এসে খবর দিলে, পুরন্দরকে প্রভা ডাক্‌ছে। বেশ দেখ্‌লুম, শুনেই শ্রীর মুখের উপর একটা বিরক্তির আভাস ফুটে উঠল, একটু তীক্ষ্ণ স্বরেই সে বল্লে, "না, এখন তুমি এখানেই থাকো!"

বটে! পুরন্দর যে প্রভার সঙ্গে মেলা-মেশা করে, শ্রীর তাতে আপত্তি আছে! আমাদের এই হিন্দুর ঘরের মেয়েদের আমি জানি। স্ত্রী-পুরুষ-দের অবাধ মিলন দেখ্‌তে এখনো এরা অভ্যস্ত হয়-নি; তাই বাইরে কোন যুবতীর সঙ্গে স্বামীকে আলাপ করতে দেখ্‌লেই, এদের মন সন্দেহের বিষে কালো হয়ে ওঠে। শ্রীও তাহলে এই দলে? বেশ, বেশ, আমিও ত তাই চাই!

আর-একদিন ঘরে ঢুকে দেখি, শ্রী বসে বসে কি একখানা বই পড়্‌ছে। এম্‌নি তন্ময় ছিল সে, যে আমার পায়ের শব্দও তার কাণে গেল না। সাম্‌নে একটু ঝুঁকে পড়ে দেখে নিলুম, তার হাতের কেতাবখানা কি?—সেখানা হচ্ছে "বশীকরণ তন্ত্র"। শ্রী যে জায়গাটা পড়্‌ছিল, সেখানে বড়-বড় হরফে স্বামী-বশীকরণের মন্ত্র লেখা রয়েছে!

আমি তখন সাড়া দিয়ে বল্লুম, "বৌদিদি!"

শ্রী চম্‌কে উঠে, এক-নিমেষে বইখানা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেল্‌লে!

—"কি পড়্‌ছিলে বৌদিদি!"

—"ও একখানা বই।"

—"কি বই, নামটা শুনি না!"

—"ভারি ত একখানা বাজে বই, তার আবার নাম শুনে কি হবে?"

—"কিন্তু নামটা আমি যে দেখে ফেলেছি বৌদিদি।"

শ্রী একটু লজ্জিত হয়ে বল্‌লে, "তা দেখেচ ত দেখচ! আমি ত আর চুরি কর্‌ছিলুম না!"

—"না, চুরি কর্‌বে কেন, তুমি স্বামী বশ কর্‌বার মন্ত্র পড়্‌ছিলে! আচ্ছা বৌদিদি, তুমি কি মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, শিকড়—এ-সবে বিশ্বাস কর?"

—"মন্ত্রে-তন্ত্রে ওষুধ-বিষুধে কখনো কি মানুষের মন ফেরানো যায়? এও কি সম্ভব?"

—"তবে তুমি ও-বইখানা পড়্‌ছিলে কেন?"

—"হাতের কাছে বইখানা পেলুম, কি আর করি, বসে-বসে পাতা ওল্টাচ্ছিলুম। নৈলে ও-সবে আমার একটুও বিশ্বাস নেই।"

—"কিন্তু বৌদিদি, আমি ওষুধের গুণে বিশ্বাস করি!"

শ্রী ভারি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, "তুমি বিশ্বাস কর?"

মনে মনে হেসে বল্‌লুম, "কেন কর্‌ব না? আমাদের ডাক্তারী বইয়ে এমন ওষুধ অনেক আছে, যাতে লোকের মন ফেরানো যায়!"

শ্রী আগ্রহ-ভরে বলে' উঠ্‌ল, "বল কি ঠাকুরপো! এমন ওষুধও আছে?"

—"তা আছে বৈকি!"

এমনসময় ঘরের বাইরে পুরন্দরের সাড়া পাওয়া গেল।

শ্রী চুপিচুপি বল্‌লে, "ঠাকুরপো, লক্ষ্মীটি, এ বইয়ের কথা ওঁকে জানিও না!"

অনেক মাথা ঘামিয়েও যখন কোন উপায় ঠাওরাতে পাচ্ছিলুম না, তখন সেদিনকার এই ব্যাপারটা আমার মনের ঝাপ্‌সা ভাব অনেকটা

পরিষ্কার করে' দিলে। এত দিনে আমি চল্‌বার ঠিক পথ খুঁজে পেয়েছি, আর আমাকে ঘুরে মর্‌তে হবে না!

এখন এই দুটি সূত্র ধরে আমাকে কাজ কর্‌তে হবে।

ক। স্বামী পাছে অন্য রমণী দেখে মুগ্ধ হয়, শ্রী মনে মনে সেই ভয়ে অস্থির।

খ। স্বামী-বশীকরণ মন্ত্রে বা ওষুধে শ্রীর বিশ্বাস আছে। মুখে সে যে এ-কথা মান্‌ছে না, তা লজ্জা ভিন্ন আর-কিছু নয়!

আমি যে কাজ কর্‌তে বসেছি, সে কাজে সফল হবার প্রধান উপায়, মনোবিজ্ঞান তলিয়ে বোঝা। পুরন্দর, শ্রী আর প্রভা—এদের প্রত্যেক কথাটি, প্রত্যেক ভাবটি পর্য্যন্ত আমাকে লক্ষ্য করতে হবে। মুখের একটি ছোট্ট কথায়, চোখের একটুখানি বাঁকা চাহনিতে, অনেকসময়ে কত যে গোপন অর্থ, অজ্ঞাত ভাব, চরিত্রের রহস্য জান্‌তে পারা যায়, অনেকেই তা জানে না। মানুষের চরিত্র বুঝতে গেলে, কেবল তার বাইরের চেহারা, তার ব্যবহার বা কাজকর্ম্ম লক্ষ্য কর্‌লে কিছুই জানা যাবে না;—কারণ সে-সব হচ্ছে কৃত্রিম। কিন্তু মানুষের চোখে-মুখে সময়ে-অসময়ে যে-সব ভাবের ইঙ্গিত বিদ্যুতের মত ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়, যারা সেই ক্ষণিক প্রকাশকে সামান্য বলে' অবহেলা করে না, নর-চরিত্রের গুপ্তকথা তারাই খোলা পুঁথির মত অনায়াসে পাঠ কর্‌তে পারে। আমিও যদি এখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করে' চোখ-কাণকে সজাগ-সতর্ক রাখি, তার-পর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করি, তাহলে শ্রীও আমার মুঠোর মধ্যে আস্‌বে, পুরন্দরও বুঝতে পার্‌বে, আমার প্রতিহিংসা কী ভয়ানক!

দুনিয়ায় ন্যায়-অন্যায়ের যে-সব বাঁধা বুলি আছে, সে-সব আমার জন্যে

তৈরি নয়। টিয়া-ময়নার মত পরের বুলি মুখস্থ করে' করে' সাধারণ লোক-গুলো আপনাদের চিন্তাশক্তি একেবারে হারিয়ে বসে আছে;—তাদের দ্বারা তাই কোন বড় কাজ সম্ভব হয় না। আমার ন্যায়-শাস্ত্র বলে, যাতে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, তাই কর্ত্তব্য; যাতে তা হবে না, সেটাই হচ্ছে অকর্ত্তব্য। ভালো-মন্দ, সু ও কু ব'লে কোন কথা নেই—ও-সব হচ্ছে দুর্ব্বলের ওজর, অক্ষমের আত্মপ্রবোধ। ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাটি হাতে করে' নেপোলিয়ন সম্রাট হন-নি, সেকেন্দর দিগ্বিজয় করেন-নি। কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি করতে হ'লে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ছলনা হচ্ছে সত্যের চেয়ে ঢের-বেশী শ্রেষ্ঠ, কার্য্যকর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বয়ং আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন। দ্রোণাচার্য্যের বধ-কাহিনী এই অমূল্য শিক্ষারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। স্বার্থসিদ্ধির পথে দ্রোণাচার্য্য এসে কণ্টকের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে', ধর্ম্মপুত্র হয়েও যুধিষ্ঠির গুরু-বধকে পাপ মনে করেন-নি,—তাও আবার মিথ্যাকথা কয়ে।

এখন প্রভাকে নিয়ে কি করা যায়?—এটা ঠিক যে, তার সঙ্গে আমাকে আরো কঠোর ব্যবহার করতে হবে। এটা সে স্পষ্টই জেনেছে যে, আমি তাকে একটুও ভালো বাসি না। হাব-ভাব-ব্যবহারে এইবার তাকে আরো জানাতে হবে, সে আমার দু-চোখের বিষ। প্রভাকে আমি ভালো না বাসলেও সত্যি-সত্যি সে আমার দু-চোখের বিষও নয়, তার প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করাও আমার মনের ইচ্ছা নয়। কিন্তু তবু আমাকে বাধ্য হয়েই নির্দ্দয়তার এই মিথ্যা অভিনয়টা করতে হবে। অথচ, এটা যে কেবল অভিনয়, এ সত্যটা তাকে কিছুতেই জানতে দেওয়া হবে না। দেখি, অত্যাচারে হতাশ হয়ে প্রভা তার প্রেমহীন

জীবনটাকে, দুর্ব্বহ মনে করে' আমার অভীষ্ট-সিদ্ধির পথে নিয়ে গিয়ে ফেলে কি না?

সাত

শ্রীর কথা

বিনোদবাবু জোর করে' আমার ঠাকুর-পো হয়েছেন! তাঁকে বিনোদবাবু বলে' ডাক্‌লে তিনি মুখভার করেন। রাগ করে' অভিমানের স্বরে বলেন, 'যে আমার শৈশবের প্রাণের বন্ধু, তার স্ত্রী হয়ে তুমি কিনা আমাকে পর ভাবো!'

বাস্তবিক, এই লোকটিকে আমার আগে একটুও ভালো লাগ্‌ত না। আর সত্যিকথা বল্‌তে কি, ইনিও আগে ভালো লাগ্‌বার মত কাজও করেন-নি;—আমার বিয়ের রাতে এঁর যে মূর্ত্তি আমি দেখেছিলুম! কিন্তু এখন দেখছি, আসলে ইনি লোক নেহাৎ মন্দ নন। বেশ মেলা-মেশা কর্‌তে পারেন, কথাবার্ত্তা-গুলিও দিব্যি মিষ্টি—একটু যা দোষ, বড় গায়ে-পড়া!

এই দেখনা, সেদিন এসে ধন্না দিয়ে পড়্‌লেন, আমাকে গান গাইতে হবে! শুনেই ত আমার চক্ষুস্থির! আজ-পর্য্যন্ত স্বামীর সাম্‌নেই কখনো গান গাইতে পারি-নি, আর আমি কিনা গান গাইব এঁর সাম্‌নে! আমি বল্লুম, "ঠাকুরপো, তুমি কি পাগল হয়েচ? কি-যে বল তার ঠিক নেই!"

—"কেন বৌদি, আমি ত বেঠিক কিছু বলি-নি! ঠাকুরপোর সাম্‌নে আর লজ্জা কি?"

—"লজ্জার কথা হচ্ছে না, গান গাইতে জান্‌লে তবে ত গাইব!"

—"না বৌদি, তুমি লুকুচ্চ। পুরন্দরের স্ত্রী গান গাইতে জানেন না! এও কি হয়?"

—"জান্‌লেও আমি গাইতুম না। ঘরের বৌ ত বাইজী নয় যে সকলের সাম্‌নেই নেচে গেয়ে ধিঙ্গি হয়ে বেড়াবে!"

—"না বৌদি, তোমাকে গাইতেই হবে! লক্ষ্মীটি, বেশী নয়—একটি-মাত্র গান!" এই বলেই তিনি আমার একখানা হাত ধরলেন।

চোখের নিমেষে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাগ করে' আমি বললুম,—"ওকি! ছিঃ!"

কাঁচুমাচু মুখে, অপ্রস্তুত হয়ে ঠাকুরপো বল্‌লেন, "রাগ কোরো না বৌদি! আমি তোমাকে ঠিক নিজের বৌদিদির মতই দেখি, হাত ধর্‌লে তুমি যে আবার রাগ কর্‌বে অতটা আমি খেয়াল করি-নি!"

—"না, এ-সব আমি ভালোবাসি না!"

—"আমার স্ত্রী পুরন্দরের সাম্‌নে অত গান গায়, তাইতেই আমি ভেবেছিলুম আমার সাম্‌নে গান গাইতে তোমারও হয়ত আপত্তি হবে না।"

—"তোমার স্ত্রী আমার স্বামীর সাম্‌নে গান গায়, এটা আমি ভালো কাজ মনে করি না।"

—"কেন?"

—"কেন, তা আগেই বলেচি। ঘরের বৌ বাইজী নয় ঠাকুরপো!"

—"কথাটা তুমি বাড়িয়ে বলচ বৌদি! পুরন্দর কি আমার পর?"

—"মেয়েমানুষের কাছে স্বামী ছাড়া আর সব পুরুষই পরপুরুষ।

তাদের সঙ্গে মিশ্‌তে গেলে সাবধানে থাক্‌তে হয়। নৈলে কপাল পুড়্‌তে দেরি লাগে না।"

ঠাকুরপো হাসতে হাসতে বল্‌লেন, "কিন্তু এখানে কে কার কপাল পোড়াচ্ছে বৌদি? তুমি কি তোমার স্বামীকে বিশ্বাস কর না?"

—"স্বামীকে বিশ্বেস করার কথা তুল্‌চ কেন ঠাকুরপো! মন যে তুলোর মত হাল্‌কা, একটু বাতাসেই কোথায় উড়ে পালায়, আর ধরা যায় না।"

—"না বৌদি, পুরন্দরকে আমি বিশ্বাস করি। তার মন হাল্‌কা নয়, তাই ত তার হাতে প্রভাকে আমি অবাধে ছেড়ে দিয়েচি। এখন তারা দুজনেই দুজনকে বন্ধুর মত ভালোবাসে, একসঙ্গে ওঠে-বসে, হাসে গায় গল্প করে। এই কাল্‌কেই আমি ঘরে ঢুকে দেখলুম, প্রভা পুরন্দরের বুকে হাত দিয়ে কি কর্‌চে! আমি—"

আমি বাধা দিয়ে বল্‌লুম, "কি, আমার স্বামীর বুকে হাত দিয়ে—"

—"অত-বেশী চম্‌কো না বৌদি, আগে সবটা শোনো! আমি ঘরে ঢুকে বল্‌লুম 'কি হচ্ছে প্রভা?' প্রভা বল্‌লে 'পুরন্দরবাবুর গলার বোতামটা ছিঁড়ে গিয়েচে কিনা, তাই একটা নতুন ঝিনুকের বোতাম বসিয়ে দিচ্ছি।' —আমি আর কিছু না বলে ঘর থেকে চলে এলুম।"

আমি রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "সেই অবস্থায়, দুজনকে সেই ঘরে রেখে?"

—"হ্যাঁ, তাতে হয়েচে কি? এ-কথাটা তোমাকে কেন বল্‌লুম জানো?"

—"কেন, শুনি?"

—"তুমি হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই—এই ব্যাপারটা ভারি খারাপ

ভাব্‌বে। কিন্তু আমি বল্‌তে চাই, এটা কিছুমাত্র তুচ্ছ নয়। এই যে এখনি, আমি তোমার হাত ধরতেই তুমি একেবারে আঁৎকে উঠ্‌লে, সেটা কি ঠিক? সরল নিষ্পাপ মনে কেউ কিছু কর্‌লে তাতে কোন দোষ নেই। মন যেখানে খারাপ আসল পাপ হচ্ছে সেইখানে।"

—"ঠাকুরপো, তোমরা আজকাল লেখাপড়া শিখে আমাদের চেয়েও বোকা হয়ে যাচ্ছ। আমরা ত সোজাসুজি এই বুঝি যে, আগুন নিয়ে খেলা কর্‌তে নেই। ছোট ছেলে যখন পিদিমে হাত দেয়, তখন সরল মনেই হাত দেয়। তাবলে কি তার হাত পোড়ে না?"

—"তুমি আমার কথা বুঝচ না বৌদি! যাক্, আর বুঝিয়েও কাজ নেই। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে' যাই। তুমি যেন পুরন্দরের কাছে এ গল্পটা করে' বোসো না! সে তাহলে ভাব্‌তে পারে, আমি প্রভার নামে তোমার কাছে লাগাতে এসেছিলুম!"

ঠাকুরপো চলে গেলে পর আমি নিজের মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম। মেজাজটা আজ ভারি খারাপ হয়ে গেল।

এমনসময়ে স্বজনী এসে ঘরে ঢ়ুকে বল্‌লে, "হ্যাঁলা, ও-বাড়ীর হাওয়া শেষটা তোরও গায়ে লাগ্‌ল নাকি?"

স্বজনী আমার সমবয়সী সখী—ঠিক আমাদের সুমুখের বাড়ীতেই থাকে। দুপুর বেলায় সে প্রায়ই আমার সঙ্গে গল্প কর্‌তে আসে।

আমি বল্‌লুম, "ও-বাড়ীর হাওয়া আবার কাকে বলে?"

—"ওলো, এই পাশের বাড়ীর কথা বল্‌চি।"

—"হ্যাঁ, তা হয়েচে কি?"

—"তুইও দেখ্‌চি যে ঐ খিষ্টান-মাগীর মত বেহায়া হয়ে উঠেচিস্!

ওর কর্ত্তাটির সঙ্গে এতক্ষণ ধরে' কি মনের কথা হচ্ছিল বল্ ত। পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমার পায়ে খিল ধরে আস্‌ছিল, তবু তোদের ছেয়ের গল্প যেন আর শেষই হ'তে চায় না!"

—"দূর পোড়ারমুখী, ও যে আমার ঠাকুরপো হয়!"

—"তা তোমার ঠাকুরপোটির গিন্নি কিন্তু ভালোমানুষ নয় ভাই! মাগী যাদু জানে।"

—"সে আবার কি?"

—"হ্যাঁ, ও যাদু জানে। আমাদের ঘর থেকে তদের বাড়ীর খানিকটা দেখা যায় জানিস্ ত? আমার স্বামীটি আজকাল তাই জান্‌লার ধারেই বাসা বেঁধেচেন। দিন-রাত খালি ঐ জান্‌লার কাছেই ঘুর্‌ঘুর্ কর্‌চেন আর ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে' ওদের বাড়ীর দিকে দুঃখীর মত তাকিয়ে আছেন, —কখন্ ঐ ডাইনি-মাগীর মুখখানি তাঁর চোখে পড়্‌বে, সেই ভাব্‌নায় তাঁর আহার-নিদ্রা সব ঘুচে গেছে!"

—"প্রভাকে তুই দেখেচিস্ স্বজনী?"

—"ওমা, তা আর দেখি-নি! ওকে ছাখে-নি কে? রোজ দু-বেলা সকলের সাম্‌নে দিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে বেড়াতে যায়—সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের ট্যাম্‌টেমির মত তোমার স্বামীটিও তার পিছনে-পিছনে লেগে থাকেন। হ্যাঁ ভাই শ্রী, তুই তোর বরকে মানা কর্‌তে পারিস্ না?"

—"কাকে মানা কর্‌বো ভাই, আমার কথা শুন্‌বে কে? ওঁরা এখন স্ত্রীলোকদের স্বাধীন কর্‌তে চান, কাঙালের কথা বাসি না-হ'লে মিষ্টি লাগ্‌বে কেন?"

—"যা বলেচিস্। প্রভা-ঠাক্‌রুণের ডানা বোধ হয় ভালো করে'

খোলে-নি এখনো। কিন্তু দুদিন পরে যখন ফুড়ুক্ করে' উড়ে পালাবে. সেদিন তোর ঠাকুরপোটির কি দশা হবে বল্ দেখি ?”

—“কি আর হবে ? হতাশ হয়ে আর-একটা বিয়ে করে' ফেল্‌বে।”

—“আর তার জন্যে যে গারদ তৈরি হবে, তাতে কোথাও একটা মাছি-ঢুকবার ঘুলঘুলিও থাক্‌বে না! কি বলিস্ ? আচ্ছা ধর্‌লুম, তোর ঠাকুরপো যেন এক বৌয়ের বদলে আর-একটা বৌ পেয়ে বর্ত্তে যাবেন, কিন্তু তোর ত আর একটি বৈ দুটি বর জুটবে না ভাই, নিজের বরটিকে পরের হাতে সঁপে দিয়ে কেমন করে' তুইও নিশ্চিন্তি হয়ে আছিস্ বল্-দিকি!”

—“কপালে দুঃখ থাক্‌লে কে তা খণ্ডাবে বল ? আমি আর কি কর্‌ব ?”

—“কেন, ও-পাড়ার রাঙা-দিদি ত অনেক মন্ত্র-তন্ত্র, গুণ-টুন্ জানেন, তাঁকে একদিন ডেকে পাঠিয়ে দেখ্ না, যদি তোর একটা সুরাহা কর্‌তে পারেন!”

—“ঠাকুরপো সেদিন বল্‌ছিলেন, ওঁদের ডাক্তারীতেও নাকি মানুষের মন ফেরাবার ওষুধ আছে।”

—“সত্যি ? তাহলে উনি ওঁর বার-ফট্‌কা বৌটিকে বশ কর্‌তে পার্‌চেন না কেন ?”

—“ময়রা কি সন্দেশ খায় না ? নিজে ডাক্তার, তাই বোধহয় ওষুধে অরুচি।”

—“তাহলে তোর ঠাকুরপোর কাছ থেকে তুই একটা ওষুধ চেয়ে নে না!”

—"না ভাই, সে আমার লজ্জা করে।"

—"আচ্ছা মেয়ে যাহোক্ তুই! এ-সব কাজে আবার লজ্জা! বেশ, নিজের জন্যে না-পারিস্ আমার জন্যে একটা ওষুধ চেয়ে নিস্ ত!"

—"কেন, তোর আবার কিসের জন্যে ওষুধ চাই?"

—"আমার উড়ু-উড়ু বরটির ডানা আড়ষ্ট করে' দিতে চাই। দেখিস্, ভুলিস্-নে যেন, —মাথার দিব্যি!"

স্বজনী চলে গেল।

আট

প্রভার কথা

আমাকে নিয়ে স্বামী আমার কি করতে চান? দিন-কে-দিন তাঁর চরিত্র যেন ক্রমেই দুর্বোধ হয়ে উঠছে!

তিনি আমাকে ভালোবাসেন না, এ আমি জানি। কিন্তু এতদিন এ-ভাবটা তাঁর মনের ভিতরেই লুকানো ছিল—বালির নীচে নদীর ধারার মত বাইরে সেটা প্রকাশ পেত না। এখন কিন্তু তাঁর অসহিষ্ণুতা আমাকেও অসহিষ্ণু করে' তুলছে।

আজকাল তিনি আমার সঙ্গে যে-সব কথা কন, যে-সব ব্যবহার করেন, তা যেমন কর্কশ তেমনি অভদ্র!

আমি ত তাঁর কাছে কোন দোষে দোষী নই! বরং তাঁর মন-পাবার জন্যে সর্বদাই আমি তাঁর মন-যুগিয়ে চলি। তাঁর মুখ না-চেয়ে আমি ত কোন কাজ করি না!

তবে কেন তিনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন? কেন তিনি কথায়-কথায় রেগে ওঠেন, আমাকে মন্দ কথা বলেন, আমাকে দেখ্‌লেই মুখভার করেন? আজ ক-দিন থেকে তিনি আবার শোবার ঘর পর্য্যন্ত বদ্‌লেছেন—আমার সংসর্গ যেন তাঁর অসহ্য!......তাঁর এই পরিবর্ত্তনটা সুধু আশ্চর্য্য নয়,—আকস্মিক!

অনেক ভাবলুম, কিন্তু নিজের কোন দোষই আবিষ্কার করিতে পারলুম না। স্বামীর এই নূতন মূর্ত্তি আমার কাছে যেন কেমন একটা রহস্যের মত মনে হ'তে লাগল।

পুঁথি-পত্রে প্রায়ই একটা কথা পড়ি,—'রমণী-চরিত্র দুর্জ্জেয়'। আমি ত দেখছি ঠিক উল্টোটাই! আমার কাছে ত আমার পুরুষজাতীয় স্বামীর চরিত্রটি অপঠিত তাম্রশাসনের মত দুর্ব্বোধ বলে মনে হচ্ছে—এর একবর্ণও আমি বুঝতে পার্‌ছি না। আসল কথা, মানুষের চরিত্রই জটিল—এখানে পুরুষ-নারীর জন্যে আলাদা ব্যবস্থা যিনি করেন, নিশ্চয়ই তাঁর এক চোখ বন্ধ!

.....একটা কথা সর্ব্বদা আমার মনে হয়। আমার স্বামী আর পুরন্দরবাবু দুজনেই দুজনের পরম বন্ধু, অথচ দুজনের মধ্যে কতটা তফাৎ! পুরন্দরবাবুর স্বভাব কী মধুর, কী সহানুভূতি-ভরা, কী হাস্য-আনন্দে উজ্জ্বল! পরের দুঃখ-কষ্টে দেখেছি, তিনি নিজের প্রাণে সমান ব্যথা অনুভব করেন। এই সেদিন তিনি আমার কুকুর কালিন্দীর অসুখে, ঠিক ছোট ছেলের মতই অধীর হয়ে পড়েছিলেন। তিনটি বাচ্চা প্রসব করে' কালিন্দীর হঠাৎ অসুখ হয়েছিল। পুরন্দরবাবু না-থাক্‌লে সে নিশ্চয়ই মারা পড়ত। তিনি সারাক্ষণ তার পাশে বসে থাকেন দেখে আমার স্বামী

তাঁকে হেসে বল্‌লেন, "ওহে পুরন্দর, একটা জানোয়ারের পেছনে অতটা বাড়াবাড়ি কর্‌লে তোমার দয়ার ভাণ্ডার শীঘ্রই খালি হয়ে পড়বে। তখন মানুষের দুর্দ্দিনে তোমার সে শূন্য ভাণ্ডার কিছুই কাজে লাগ্‌বে না!"

পুরন্দরবাবু কালিন্দীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বল্‌লেন, "বিনোদ, তোমার-আমার মত এই কুকুরটিরও প্রাণ আছে। সুখে-দুঃখে এও খুসি হয়, এও কাতর হয়! এ প্রাণ ত অবহেলার জিনিষ নয়! বিশেষ, অবোলা জীবের কষ্ট দেখ্‌লে কোন মতেই আমি স্থির থাকৃতে পারি না। আহা, যাতনায় এর চোখ দিয়ে জল পড়্‌চে, দেখ্‌তে পাচ্চ না?"

স্বামী সেদিকে না-তাকিয়েই বল্‌লেন, "পুরন্দর, তোমার উচিত ছিল স্ত্রীলোক হয়ে জন্মানো।"

—"কেন?"

—"এমন দুর্ব্বলতা পুরুষের শোভা পায় না।"

—"হ্যাঁ, এই দুর্ব্বলতা রমণীর আছে বলেই আমরা বাইরের পৃথিবীতে যখন আঘাত পাই, তখন অন্তঃপুরে রমণীর স্নেহের ছায়ায় এসে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। দয়া-মায়াকে তুমি যদি দুর্ব্বলতা বল বিনোদ, তাহলে আমি তোমার মত সবল হ'তে চাই না।"

স্বামী একটুখানি মুখটেপা হাসি হেসে বল্‌লেন, "আচ্ছা, দিনকতক পরেই আমি তোমাকে বেশ করে' বুঝিয়ে দেব যে, দুনিয়ার হাটে দয়ার দাম একটি কাণাকড়িও নয়। এখানে ডঙ্কা মেরে বিকিয়ে যায়, নির্দ্দয়তা।"

পুরন্দরবাবুও অল্প-একটু হেসে ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন, "কিন্তু অবুঝকে তুমি ত বোঝ মানাতে পার্‌বে না বিনোদ! দয়ার যদি খরিদ্দার না

জোটে, তাহলে আমি বল্‌ব, অমূল্য বলেই দয়াকে কেউ কিন্‌তে পার্‌লে না।"

* * * *

আমার টেবিলের উপরে একখানি খাতা ছিল। একলা বসে-বসে যখন আর ভালো লাগ্‌ত না, তখন সেই খাতার পাতায় আমি হিজিবিজি কবিতা লিখতুম্‌। সেই খাতা এক দিন গিয়ে পড়ল পুরন্দরবাবুর হাতে।

পুরন্দরবাবু অনেকক্ষণ ধরে কবিতাগুলি খুব মন দিয়ে পড়তে লাগ্‌লেন। লজ্জায় মাথা হেঁট্‌ করে' আমি বসে রইলুম,—ছিঃ, ঐ রাবিসগুলো পড়ে মনে-মনে না-জানি তিনি কতই হাস্‌ছেন! কেন যে মরতে খাতাখানা ওখানে রেখেছিলুম!

পুরন্দরবাবু সমস্তটা পড়ে খাতাখানা আবার টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে চুপ করে' বসে রইলেন।

আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "হঠাৎ আপনি অতটা নীরব কেন? আমার রাবিসের ভারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নাকি?"

তিনি আমার মুখের উপরে তাঁর সুন্দর প্রশান্ত চোখদুটি স্থির করে' ধীরে ধীরে বল্‌লেন, "না। অনেকদিন ধরেই আমার মনে যে কথাটা উঁকিঝুঁকি মার্‌ছিল, তোমার কবিতা পড়ে আজ সেটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি সেই কথাটাই ভাবছিলুম প্রভা!"

তাঁর কথার অর্থ না-বুঝে আমি বল্লুম, "আমার কবিতায় আপনার মনের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল? এ ভারি আশ্চর্য্য ত!"

—"হ্যাঁ প্রভা! ঠিক তাই। সত্যই আমার মনে হ'ত, তোমার মনের ভিতর যেন কি-একটা যাতনা লুকানো আছে।"

আমি চম্‌কে উঠলুম!

তিনি বল্‌লেন, "আজ তোমার কবিতাগুলিও পড়ে দেখ্‌লুম, এর একটিও সুখের কবিতা নয়। এগুলি তুমি যেন লিখেচ অশ্রুজলে কলম ডুবিয়ে!"

আমি যে সুখী নই, পুরন্দরবাবু তা জান্‌তে পেরেছেন! কি বল্‌ব ভেবে না-পেয়ে মুখ নীচু করে' আমি বসে রইলুম।

দরদ-ভরা স্বরে পুরন্দরবাবু বল্‌লেন, "কিসের কষ্ট তোমার প্রভা? আমি তোমার বন্ধু, আমাকে বল্‌বে না?"

মনের যাতনা মনেই চেপে রাখা যে আরো কত-বড় যাতনা, আমি তা জানি গো জানি! কিন্তু কাকে বল্‌ব সে কথা—এত-দিন ত আমার এমন-কেউ মরমী ছিল না যে, সে কথা জিজ্ঞাসা করে! আজ তাই পুরন্দরবাবুর মমতাপূর্ণ জিজ্ঞাসা শুনে আমার মন আত্ম-প্রকাশ কর্‌বার জন্যে যেন ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল—সে গভীর সমবেদনায় আমার চোখের পাতাও আপনা-আপনি সিক্ত হয়ে উঠল!

আমার চোখের জল পুরন্দরবাবুর চোখ এড়াল না। কাছে এগিয়ে এসে তিনি আমার একখানি হাত নিজের হাতের ভিতরে নিয়ে বল্‌লেন, "কেঁদনা প্রভা, কেঁদনা! আমার জিজ্ঞাসায় তুমি যদি ব্যথা পেয়ে থাক, তাহলে আমি ক্ষমা চাইছি।"

গাঢ় স্বরে আমি বল্‌লুম, "না পুরন্দরবাবু আপনার কথায় আমার কোন কষ্ট হয়-নি।"

—"তবে? তবে তুমি কাঁদচ কেন?"

—"সে কথা আর-একদিন বল্‌ব পুরন্দরবাবু, আজ আমাকে রেহাই

দিন"—এই বলে আর উত্তরের অপেক্ষা না-রেখে, সে ঘর ছেড়ে আমি চলে এলুম।......

যে-সময়ে স্বামীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে জীবন আমার বিষাক্ত হয়ে উঠ্‌ছিল, ঠিক সেই-সময়ে পুরন্দরবাবুর এই মধুর সহানুভূতি, শান্তিজলের ধারার মত আমার দগ্ধ প্রাণকে স্নিগ্ধ-শীতল করে' তুল্‌লে। তাঁকে আমার দরদের দরদী জেনে আমার হতভাগ্যের যন্ত্রণা যেন অনেকটা কমে গেল। আমার কৃতজ্ঞ মন যেন ডাক্ দিয়ে তাঁকে বল্‌তে চাইলে, হে বন্ধু, তোমার আকৃতি সুন্দর, তোমার প্রকৃতি সুন্দর—তোমার সকলি সুন্দর। তোমাকে আমার আপন-জনের মত লাভ করে' আমি ধন্য হলুম—আমি ধন্য হলুম!

কিন্তু তবু আমার মনের গোপন যাতনা তাঁকে আমি জানাতে পার্‌লুম না,—পার্‌লুম না ঠিক নয়, জানাতে সাহস কর্‌লুম না। কারণ, এটা আমি ঠিক বুঝেছিলুম যে, আমার দুঃখের কাহিনী শুন্‌লে পুরন্দরবাবু কখনো নীরব থাক্‌বেন না। তিনি যে-রকম সরল, স্বামীর মন ফেরাবার জন্যে নিশ্চয়ই চেষ্টা কর্‌বেন। কিন্তু আমার স্বামীটিকে আমি যতটা ভালো করে' চিনেছি, বন্ধু হ'লেও তিনি ততটা তলিয়ে চেনেন-নি। স্বামী যদি একবার বুঝ্‌তে বা জান্‌তে পারেন যে, তাঁর আসল রূপ আমি অন্যের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছি, তা'হলে তিনি আর-কখনো আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন না। সাধ করে' নিজের বিপদ ঘনিয়ে তোলার চেয়ে মৌন থাকাই ভালো; নিয়তির গতি বানের ধারার মত অবাধ—লোকের কথায় সে ফেরে না।

এম্‌নিভাবে দিনের পর দিন চাকা-ভাঙা গাড়ীর মত ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে

যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে। আমার কাতরতা, মিনতি, চোখের জল,—এ-সব কিছুই স্বামীকে নরম কর্‌তে পার্‌লে না, উল্টে দিনে দিনে তিনি যেন আমার কাছ থেকে ক্রমেই আরো তফাতে গিয়ে পড়্‌ছেন। অথচ আজ-পর্য্যন্ত তাঁর এই বিরাগের কোন কারণ বুঝ্‌তে পারলুম না!

কিন্তু স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যেমন কমে আস্‌ছে, পুরন্দরবাবুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব তেম্‌নি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ছে। আসল কথা না-জান্‌লেও, আমি যে দুঃখী এইটুকু জানাই বোধহয় তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হয়েছিল। কারণ সেদিনকার সেই ব্যাপারের পর থেকে তিনি নানা ভাবে—গান গেয়ে, বাঁশী বাজিয়ে, গল্প করে'—আমাকে প্রসন্ন রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌তেন। তাঁর এই প্রয়াস আমি বেশ বুঝ্‌তে পারতুম। বাস্তবিক, তিনি না-থাকলে আমার দিন-চলা ভার হয়ে উঠ্‌ত!

ধীরে-ধীরে পুরন্দরবাবু আমার মনের ভিতরে এতখানি জায়গা জুড়ে বস্‌লেন যে, হঠাৎ কোনদিন কোন কারণে তিনি না-এলে আমার মনে হ'ত, বৃথাই গেল সেদিনটা!

পুরন্দরবাবুর প্রাণের পরিচয় যত বেশী করে' পাচ্ছি, ততই সেই এক-কথাই বারবার আমার মনে হচ্ছে—এঁতে আর আমার স্বামীতে কী তফাৎ! পুরন্দরবাবুকে যে রমণী স্বামীরূপে লাভ করেছে, না-জানি সে তপস্যা করে-ছিল কত জন্ম ধরে'!

শুনেছি পুরন্দরবাবুর স্ত্রীর নাম শ্রী। আমার বড় ইচ্ছে তাঁর সঙ্গে আলাপ করি। কিন্তু কেন জানি না, স্বামীর তাতে অত্যন্ত আপত্তি! পুরন্দরবাবুও একদিন বল্‌লেন, "তুমি এমন একলা থাক কি-করে' প্রভা?"

—"দোকলা কোথায় পাব বলুন?"

—"কেন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে ত অনায়াসে তুমি আলাপ কর্‌তে পার!"

অনায়াসে যে পারি না সেটা আর তাঁকে বল্‌লুম না। কিন্তু স্বামীকে আবার একদিন বল্‌লুম, শ্রীর সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই।

দৃঢ়স্বরে তিনি বল্‌লেন, "না, সে হ'তে পারে না।"

—"কেন, তাতে দোষ কি?"

—"তুমি কারণ জান্‌তে চাও? তবে জেনে রাখ, শ্রী তোমার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে রাজি নয়!"

আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "সে কি? কেন?"

—"পুরন্দরের সঙ্গে তুমি এত-বেশী মেলা-মেশা কর বলে সে তোমার ওপরে তুষ্ট নয়। সে তোমাকে হিংসা করে!"

একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম!......এমন বিষম কথা শুন্‌ব বলে স্বপ্নেও আমি ভাবি-নি!

স্বামী আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্‌লেন, "কিন্তু জেনে রাখ, আমি তোমাকে কি পুরন্দরকে একটুও সন্দেহ করি না!"—কথাগুলি তিনি খুবই কোমল স্বরে বল্‌লেন। তাঁর স্বভাব-নিষ্ঠুর স্বর সেদিন কেন যে হঠাৎ অতটা কোমল হ'ল, তখন তা বুঝি-নি। পরে বুঝেছিলুম।

স্বামী আবার বল্‌লেন, "কিন্তু সাবধান, পুরন্দরকে যেন এ-কথাটা বোলো না। তার স্ত্রীর সন্দেহের কথা তুমি জেনেছ জান্‌লে সেও হয়ত লজ্জায় আর-এখানে আস্‌বে না!"

স্বামী চলে গেলেন।.........আমি তেম্‌নি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলুম।......পুরন্দরবাবু আসা-যাওয়া করেন বন্ধুর মত, তাতেও লোকের সন্দেহ! এ সন্দেহের কি হেতু আছে? সত্যিই কি আমি আমার অজ্ঞাতসারে

বপতঙ্গের মত চলেছি জ্বলন্ত আগুনের দিকে ?......এতদিন এ-সব প্রশ্ন কখনো আমার মনে হয়-নি—তার প্রয়োজনও হয়-নি !.........আজও আমি মনের ভিতরে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে'ও, কিছুই দেখ্‌তে পেলুম না ! আমার মন যেন আজ বোবা হয়ে গেছে—আমার ডাকে সে সাড়া দিলে না গো, সাড়া দিলে না।

* * * *

* * *

* *

*
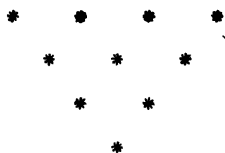
দিন-কতক পরেই-এমন একটা ঘটনা ঘট্‌ল, যাতে আমার জীবনের স্রোত একেবারে বদ্‌লে গেল।

একদিন দুপুর বেলা কি-একটা কাজে স্বামীর ঘরে গেলুম। স্বামী তখন ঘরে ছিলেন না। টেবিলের উপরে একখানা বই খোলা পড়ে রয়েছে। বইখানার নাম দেখ্‌লুম, Reports of Trials for Murder By Poisoning !

বিষ খাইয়ে যারা নরহত্যা করেছে, তাদের বিচারের বিবরণ নিয়ে স্বামীর কি দরকার ? একটু কৌতুহলী হয়ে বইখানার পাতা ওল্টাতে লাগলুম। বইখানার সর্ব্বাঙ্গে লাল-নীল পেন্সিলের দাগ আর স্বামীর হাতের লেখায় ছোট-বড় টীকা-টিপ্পনি দেখে বুঝ্‌লুম, তিনি খুব যত্ন করে'ই এখানা পড়েছেন।

পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে বইয়ের মাঝখান থেকে হঠাৎ একখানা কাগজ বেরিয়ে পড়্‌ল। তাতেও স্বামীর হাতের অক্ষরে লেখা রয়েছে দেখলুম :—

আর্সেনিক

উদর ও অন্ত্রের প্রদাহ। জ্বলন্ত যাতনা, বমি ও অতিসার। সময়ে-সময়ে জ্ঞান ও যন্ত্রণা দুইই থাকে না। কখনো-কখনো এপিলেপ্সি ও প্যারালাইসিসের সম্ভাবনা। অত্যন্ত পিপাসা। অনেক সময়ে প্রায় উদরাময় ও কলেরার মত লক্ষণ দেখা যাইতে থাকে।

এক-শো গ্রেণ শ্বেত আর্সেনিক দু-চামচে কোকোর সঙ্গে মিশাইলে কোকোর রং সামান্য হাল্কা হয় মাত্র, বিশেষ কিছু তারতম্য চোখে পড়ে না। ফুটন্ত জল ও দুধের সঙ্গে ঐ কোকো মিশাইলে, তাহার আকারে, আস্বাদে ও গন্ধে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা বুঝা যাইবে না। ঠিক ঐ পদ্ধতিতে অ্যারারুটও তৈয়ারি করা চলে।—

এই পর্য্যন্ত পড়া হয়েছে, এমন সময়ে,—আচম্বিতে পিছন থেকে আমার উপরে কে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কাগজখানা আমার হাত থেকে একটানে ছিনিয়ে নিলে! চম্‌কে, পিছন ফিরে দেখি, আমার স্বামী দাঁড়িয়ে আছেন. তাঁর মুখ মড়ার মত ফ্যাকাসে! আমি অবাক্ হয়ে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

তিনি আগে বইখানির ভিতরে কাগজখানি আবার রেখে দিলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বল্‌লেন,—"তুমি আমার দরকারি জিনিষে হাত দাও কেন?"

—"কাগজখানা পড়ে দেখছিলুম, ওতে কি আছে!"

—"কী! তুমি তা'হলে ও-কাগজখানা পড়েছ?"

স্বামীর চেহারা ঠিক পাগলের মত হয়ে উঠল—তাঁর মুখ যে এমন ভয়ানক হ'তে পারে, আগে আমাদের সে ধারণা মোটেই ছিল না।

আমি ভয়ে ভয়ে বল্লুম, "হ্যাঁ, পড়েছি, অন্যায় হয়ে থাকে ত মাপ কর আমাকে !"

স্বামী আমার একখানা হাত ধরে সজোরে ঝাঁকানি দিতে-দিতে বল্লেন, "পড়েচ ? পড়েচ ? কে তোমাকে পড়্তে বল্লে ? কার হুকুমে তুমি আমার কাগজ পড়েচ ?—" বল্তে-বল্তে থেমে আমাকে এক ধাক্কা মেরে আবার বল্লেন, "যাও, দূর হও ! ফের যদি আমার ঘরে পা দাও, তা'হলে—"

ধাক্কা খেয়ে আমি একেবারে ঘরের বাইরে গিয়ে ছিট্‌কে পড়লুম ! ....কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলুম ঠিক আচ্ছন্নের মত !...অদৃষ্টে শেষে এও ছিল ? হা ভগবান !

হঠাৎ আমার স্বামী বাইরে বেরিয়ে এলেন। আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দোষীর মত মিনতির স্বরে বল্লেন—"প্রভা, যা হ'য়ে গেছে তার জন্যে আমি মাপ চাইচি। জান ত আমি ডাক্তার, কত লোকের গুপ্তকথা আমাকে লুকিয়ে রাখ্‌তে হয় ? যে কাগজখানা তুমি দেখ্‌ছিলে, সেখানাও গোপনীয় বলেই আমার অমন রাগ হয়েছিল। রাগের মাথায় কি করতে কি করে ফেলেছি, আমি বুঝতে পারি-নি, আমাকে মাপ কর। আর —আর, ও-কাগজখানার কথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না-হয়, এর-জন্যেও তোমাকে আমি অনুরোধ কর্‌ছি !"

আমার স্বামীর মাথা আজ নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে—নইলে মুহূর্তে-মুহূর্তে তিনি এমন বদ্‌লে যাচ্ছেন কেন ?

নয়

পুরন্দরের কথা

পৃথিবীতে ক্রমেই সভ্যতা বাড়ছে বটে, কিন্তু মানুষ যে সেইসঙ্গে ক্রমেই সভ্য হ'য়ে উঠছে না, সে-বিষয়ে আমার আর একটুও সন্দেহ নেই। সৃষ্টির আদিম যুগে মানুষের উপরে যে পশুত্বের খোলস ছিল, সেটা অবশ্য এখন আমাদের চক্ষে পড়ে না। কারণ মানুষের বাহিরটা এখন মনুষ্যত্বের খোলস দিয়েই ঢাকা আছে রীতিমত!

আদিম যুগে মানুষের বাইরেকার পশুত্বকে ঠেলে মাঝে-মাঝে তার ভিতরকার মনুষ্যত্ব আত্ম-প্রকাশ করত এবং সেই প্রকাশকে সে সত্যরূপে স্বীকার করেছিল বলেই মানুষ তার বর্ত্তমান পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু সেই বাইরেকার পশুত্ব এখন মানুষের ভিতরে গিয়ে গুপ্তভাবে সুপ্ত হয়ে আছে মাত্র—একেবারে লুপ্ত হয়-নি;—থেকে-থেকে তাই তার উপরকার মনুষ্যত্বের ঘেরাটোপ ছিঁড়ে ভিতরকার সুপ্ত পশুত্ব জেগে উঠে বেরিয়ে পড়ে! পৃথিবীতে যাদের দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণ, এটা তারা নিশ্চয় লক্ষ্য করে' দেখেছে।

আমিও সেদিন উপর-উপরি এম্‌নি দুটি দৃষ্টান্ত দেখলুম।

উমানাথ আমাদের প্রতিবেশী। তার স্ত্রী স্বজনীর সঙ্গে শ্রীর খুব মাখামাখি আছে। পাড়া-পড়্‌সীর সঙ্গে লোকের যেমন জানাশুনা থাকে, উমানাথের সঙ্গে আমারও তেম্‌নি অল্প-বিস্তর মুখের পরিচয় ছিল।

একদিন বাইরের ঘরে একলাটি বসে-বসে বই পড়্‌ছিলুম। কিন্তু

সন্ধ্যার আব্‌ছায়া ক্রমেই গাঢ় হয়ে ওঠাতে বইখানা মুড়ে আমি মুখ তুলে দেখি, উমানাথ ঘরের ভিতরে এসে ঢুক্‌ল।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "কি উমানাথ, এমন-সময়ে তুমি যে এখানে?"

উমানাথ জুতো খুলে চাদরের উপরে এসে বসে বল্‌লে, "কেন, আস্‌তে কি নেই ভাই?"

—"সে কি কথা, আস্‌বে বৈকি! তবে এমন সময়ে তুমি ত বড়-একটা আমার বাড়ীতে আস না, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলুম।"

—"বিকেল থেকে মনটা আজ কেমন গুম্‌রে আছে, বাড়ীতে হাত-পা গুটিয়ে একলা একটি প্রথম শ্রেণীর জড়দগবের মত বসে থাক্‌তে আর ভালো লাগ্‌ছিল না, তাই তোমার সঙ্গে দুটো গল্পস্বল্প কর্‌তে এলুম আর কি।"

—"একলা কেন হে, তোমার অর্দ্ধাঙ্গ কি এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পিত্রালয়ে পড়ে আছেন?"

—"না, আছেন এইখানেই, কিন্তু তার সঙ্গে ত আমি কথাবার্ত্তা কইতে পাই না!"

—"বটে? তোমাদের দাম্পত্য জীবন তাহলে বিয়োগান্ত নাটকের শেষ-দৃশ্যের মত হয়ে উঠেছে বল?"

—"মোটেই না। স্ত্রীর সঙ্গে আমি কথাবার্ত্তা কইতে পাই না— এইমাত্র।"

—"পাও না? অর্থাৎ—"

—"অর্থাৎ, আমার স্ত্রীটি অশ্রান্তভাবে অনর্গল এত-বেশী বাক্যব্যয় করেন যে, তার মাঝখানে কথা-কওয়া ত দূরের কথা, সামান্য দু-একটি

কমা কি সেমি-কোলন বসাবার ফাঁক পর্য্যন্ত আমি খুঁজে পাই না। কাজেই দায়ে পড়ে আমি স্ত্রীর সাম্‌নে বক্তা না-হয়ে শ্রোতা হয়েই থাকি।"

—"বেশ কর, বুদ্ধিমানের কাজই কর। মেয়েরা যখন কথা কইতে চান, তখন তাঁদের কথায় প্রতিবাদ করতে গেলে মূল্যবান সময়ের অপব্যয় হয় মাত্র। বাঁধ দিয়ে দামোদরের বন্যা থামানো যায়, কিন্তু বাধা দিয়ে মেয়েদের কথার স্রোত বন্ধ করা ত যায়ই না, বরং সে স্রোতের বেগ খরতর করে' তোলা হয়। এ একেবারে যাচাই-করা খাঁটি কথা!"

—"কিন্তু ক্রমাগত মুখবন্ধ করে' বাড়ীতে বসে থেকে শেষটা কি সত্যি-সত্যি বোবা হয়ে যাব? কাজেই মাঝে-মাঝে পাড়া-পড়্‌সীর কাছে এসে মুখের ব্যায়াম করতে হয়।"

—"কিন্তু উমানাথ, আজ তুমি ভারি অসময়ে ব্যায়াম করতে এসেছ! আমাকে এখনি বাইরে যেতে হবে।"

—"বাইরে? কোথায়?"

—"আমাদের পাশের বাড়ীতে আমার এক বন্ধু-পত্নী আছেন, রোজ এই সময়ে আমি তাঁকে গান শেখাতে যাই।"

—"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, ও-বাড়ীতে একটি মহিলা ভারি চমৎকার গান গা'ন বটে। তা বেশ ত, চলনা আমিও তোমার সঙ্গে যাই! আমি গান শুনতে বড় ভালোবাসি।"

—"সে কি উমানাথ, তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি বল? তোমাকে ত ওঁরা চেনেন না!"

—"তুমি পরিচয় করে দিলেই চিন্‌বেন! ওঁদের বাড়ীতে পর্দ্দা-প্রথা নেই, আমার সাম্‌নে আস্‌তেও ওঁদের কিছু লজ্জা হবে না!"

—"উমানাথ, অনেকের মত তোমারও একটা মস্ত ভুল ধারণা আছে দেখ্‌ছি। কোন বাড়ীতে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে বলে, সেই বাড়ীর মেয়েরা যে চেনা-অচেনা ঘরের-বাইরের যার-তার সঙ্গে সমান ভাবে কথা কইবেন, এও কি কখনো সম্ভব ?"

—"কেন, ও-বাড়ীর মেয়েটির সঙ্গে তোমার ত খুব মাখামাখি আছে দেখতে পাই, আমাকে বন্ধু বলে সঙ্গে নিয়ে গেলে উনি আমার ওপরে নিশ্চই অসন্তুষ্ট হবেন না।"

আমি বিরক্ত হয়ে বল্‌লুম, "উমানাথ, তুমি যখন বুঝবে না, তখন আমি আর কি বল্‌ব বল ! তবে এইটুকু জেনে রাখ, তুমি যা বল্‌ছ তা অসম্ভব !"

উমানাথ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। তারপর কেমন-একটা বিশ্রী সুরে বল্‌লে, "এতে আর বোঝাবুঝির কিছু নেই পুরন্দর ! বুঝ্‌তে আমি সব পেরেছি ! আমাকে ও-বাড়ীতে নিয়ে গেলে পাছে তোমার নিজের কিছু অসুবিধে হয়, তাই তুমি এতটা নারাজ হচ্ছ ! বেশ ভাই বেশ, ওখানে তুমি একলাই তবে রাজত্ব কর, তোমার মুখের গ্রাস আমি কেড়ে নিতে চাই না।"

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লুম, "উমানাথ, এ তুমি কি বল্‌ছ !"

উমানাথ ঠোঁঠ-দুখানা উল্টে, অসভ্যের মত হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "এ কথা সুধু আমি বল্‌ছি না—পাড়ার অনেকেই বল্‌ছে ! ও-বাড়ীতে তোমরা যে প্রেমের পাঠশালাটি খুলেছ, তার খবর কে না জানে ? কিন্তু সে পাঠশালায় তোমরা যে আমার মত নতুন পোড়োকে নাও না, এটা অবশ্য আমার জানা ছিল না !"

রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ থর্‌-থর্‌ করে' কাঁপতে লাগ্‌ল। কোনক্রমে রাগ সাম্‌লে বল্‌লুম, "উমানাথ, তোমরা অতি ঘৃণ্য জীব! আমার দুর্ণামের জন্যে আমি ভাবি না,—আর সেজন্যে তোমাদের কিছু বল্‌তেও চাই না। কিন্তু আমার বাড়ীতেই বসে তুমি যে একজন মহিলার নির্দ্দোষ নামে কলঙ্ক লেপন করবে, এ কখনোই হ'তে পারে না। ওঠ, ওঠ,—উঠে যাও! ....এখনো উঠলে না? দরোয়ান!"

দ্বারবান সাড় দেবার আগেই ক্রোধারক্ত মুখে উমানাথ উঠে দাঁড়াল। অপমানিত স্বরে বল্‌লে, "আমাকে তাড়িয়ে তুমি আমার মুখ বন্ধ কর্‌তে চাও? কিন্তু তোমার নিজের স্ত্রীর মুখ কি-করে' বন্ধ কর্‌বে? তাকেও কি তাড়িয়ে দেবে?"

—"অসভ্য! আমার স্ত্রীর কথায় তোমার কি দরকার?"

—"আমার কি দরকার? কিছু না! তবে তোমার স্ত্রী যদি আমার স্ত্রীর কাছে তোমর গুণের কাহিনী বলে, তাহলে—"

—"তাহলে সে কথা আবার আমার কাছে এসে বলা তোমার উচিত নয়! যাক্‌, এ-সব উচিত-অনুচিত নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না, তুমি এখন বিদেয় হলেই আমি সুখী হব।"

উমানাথ আর-কিছু না-বলে', আমার দিকে একটা বিরাগ-ভরা দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এম্‌নি আমাদের দেশের লোক! অন্য কোন রমণীর সঙ্গে পুরুষের আলাপ হ'লেই যে-দেশের লোক সে আলাপকে প্রেমালাপ বলে' ভেবে নেয়, সে-দেশে স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতার যোগ্য করে' তোল্‌বার আগে, এখানে পুরুষদের মন তৈরি করে' তুল্‌তে হবে। আজ্‌কের এই ব্যাপারটা

দেখে বেশ বুঝতে পারছি, এদেশে স্ত্রীলোকদের চেয়ে পুরুষরাই বেশী অযোগ্য।

কিন্তু একটা কথা মনকে ব্যথা দিতে লাগ্‌ল। শ্রী, আমার সঙ্গে প্রভার সম্বন্ধটাকেও সন্দেহ করে! সুধু তাই নয়—নিজের সন্দেহের কথা আজকাল সে ঘরের বাইরেও প্রচার করছে! কী অন্যায়, কী অন্যায়!

ভাব্‌তে ভাব্‌তে শ্রীর কাছে গেলুম। শ্রী তখন আল্‌মারির তাকে কতকগুলো নতুন পুতুল সাজিয়ে রাখ্‌ছিল, আমার পায়ের শব্দে ফিরে দাঁড়াল। একটা পাথরের নাড়ুগোপাল দেখিয়ে বল্‌লে, "এটি দেখতে কেমন, বল ত? আজ কিনেছি।"

নাড়ুগোপালের সমালোচনা কর্‌বার জন্যে আমার তখন কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না। আমি তার চোখের উপরে চোখ রেখে বল্‌লুম, "শ্রী, তুমি লেখাপড়া যখন কর্‌বেই না, তখন এই-সব সাজানো-গোছানোর কাজেও তোমার মনটাকে যদি নিযুক্ত রাখ, তাহলে আমিও কিছু নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি।"

শ্রী আমার হাতদুখানা তার নিজের দিকে টেনে নিয়ে হেসে বললে, "কি গো মাষ্টারমশাই, আজ যে বড় ঘরে ঢুকেই উপদেশ সুরু কর্‌লে? ব্যাপার কি?"

—"হ্যাঁ শ্রী, ব্যাপার এতদূর এগিয়েছে যে, আমার উপদেশটা মন দিয়ে শোনা তোমার পক্ষে অত্যন্ত দরকার হয়ে উঠেছে!"

শ্রী দু-হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, তার কাণের কাছটা আমার ওষ্ঠাধরের উপরে চেপে বল্‌লে, "নাও, হয়েচে ত? আমার এই কাণের ভেতর এখন যত পার উপদেশ-বৃষ্টি কর!......কৈ গো, চুপ করে' রইলে

বড় যে? বেশ, উপদেশ যদি না দাও ত, আমার গালটা যে তোমার ঠোঁটটির কাছে আছে, তা বোধ হয় দেখতে পাচ্ছ? নিদেন সেখানে একটা—বুঝেচ?"

শ্রীর এ-সব চাপল্য এখন আমার মোটেই ভালো লাগ্‌ল না, আস্তে আস্তে তাকে সরিয়ে দিয়ে বল্‌লুম, "শ্রী, তুমি কি চাও বল দেখি? তোমার ঐ নাড়ুগোপালটির মত আমিও না নড়ে-চড়ে চুপচাপ এই আলমারির ভেতরে সাজানো থাকি?"

—"তা তুমি রাজি হবে কেন? তুমি যে ছট্‌ফটে!"

—"আমি পুরুষমানুষ হয়েও অন্তঃপুর থেকে বেরুব না, তুমি ছাড়া আর কারুর সঙ্গে কথা কইতে পাব না, এই কি তোমার মনের ইচ্ছে?"

—"ঠিক বলেছ! কিন্তু আমার মনের এত-বড় ইচ্ছেটা তুমি কি করে' জান্‌তে পার্‌লে গা? ভারি আশ্চয্যি ত!"

—"আর, তোমার এই ইচ্ছে পূর্ণ না-হ'লেই স্বামীকে তুমি অবিশ্বাস কর্‌বে, পাঁচজনের কাছে স্বামীর নামে কলঙ্ক রটাবে, যা বলা উচিত নয় এমন-সব কথা বল্‌তেও তোমার লজ্জা হবে না? ছিঃ শ্রী, তুমি যে এতটা এগুতে পার আগে আমি তা ভাবি-নি!"

এতক্ষণে শ্রীর মুখে উদ্বেগের লক্ষণ ফুটে উঠল! অবাক হয়ে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বাধো-বাধো স্বরে সে বল্‌লে, "তুমি—তুমি, কি বল্‌চ গা?"

—"উমানাথের স্ত্রীর কাছে তুমি আমার আর বিনোদের স্ত্রী সম্বন্ধে কি বলেচ?"

শ্রীর মুখ শুকিয়ে গেল। আম্‌তা আম্‌তা করে' বল্‌লে, "আমি ত এমন-কিছু বলি-নি।"

—"যতটুকু বলেচ, পাড়ার লোকের পক্ষে ততটুকুই যথেষ্ট হয়েচে! তারা তাই নিয়ে যে-সব কথা বলচে, কোন ভদ্রলোক তা শুন্‌তে পারে না। আর তাদেরি বা অপরাধ কি, নিজের স্ত্রী যাকে বিশ্বাস করে না, পরে তাকে সাধু বলে' মান্‌বে কেন? ছিছি, এমন কথাও শেষটা শুন্‌তে হোলো?"

—শ্রী ঘাড় হেট করে' কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

—"শ্রী, তোমার সন্দেহ করার এই কদর্য্য স্বভাব ছাড়ো, সব জিনিষকে বেশ সহজ ভাবে দেখতে আর বুঝ্‌তে চেষ্টা কর। এতকাল আমার সঙ্গে রইলে, এখনো আমাকে চিন্‌তে পার্‌লে না? এমন ভাবে আর বেশীদিন চল্‌লে ভবিষ্যতে তুমি কষ্ট পাবে শ্রী,—এ ছাড়া আমি তোমায় আর-কিছু বল্‌তে চাই না।"

*　　*　　*　　*　　*

সেদিন প্রভাকে গান-শেখাতে যেতে একটু রাত হ'ল। প্রভার ঘরে গিয়ে তাকে দেখ্‌তে পেলুম না। তার নাম ধরে ডাক্‌তেই পাশের ঘর থেকে বিনোদ বেরিয়ে এসে বল্‌লে, "প্রভা বোধহয় ছাদের ওপরে আছে। তুমি সেইখানেই যাও।"

ছাদে উঠে দেখি, সুন্দর চাঁদনী রাত। সমস্ত আকাশ ভরে স্বচ্ছ দুধের মত জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে পড়েছে; মাথার উপরে অবাধ অসীমতাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন পরী-লোকের মোহন স্বপ্নের মত, অপূর্ব্ব মায়ার মত। দূর থেকে নগর-বিহঙ্গের মুখেও আজ বন-শ্যামলতার

স্মৃতি-গীতি ফুটে উঠেছে এবং বাতাস যেন নিখিল প্রেমিকের প্রণয়-কামনা বক্ষে ভ'রে, দিকে দিকে পাগল হয়ে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে!

ছাদের এককোণে একখানা শীতলপাটি বিছানো। আল্‌সের উপরে রজনীগন্ধার একটা চীনেমাটির টব এবং সেই টবের উপরে দুই হাত রেখে, সাম্‌নের দিকে হেলে বুকের ভিতরে মুখ গুঁজে প্রভা, একলাটি চুপ্‌টি করে' বসে আছে।

আস্তে-আস্তে শীতলপাটির একপাশে গিয়ে আমিও বসে পড়্‌লুম। প্রভাকে ডাক্‌লুম—সে চম্‌কে উঠল, কোন সাড়াও দিলে না, মুখও তুল্‌লে না! ভাবলুম, এমন চমৎকার চাঁদের আলোয়, ঠাণ্ডা বাতাসে বোধহয় তার তন্দ্রা এসেছে।

আর-কিছু না-বলে' আকাশের দিকে চেয়ে, মৃদুস্বরে আমি বারোয়াঁয় একটা গান ধরলুম।.........

প্রভা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে, আমার দিকে ফিরে বস্‌ল।

চাঁদের আলোয় তার মুখ দেখে আমার গান আপনি থেমে গেল! কী বিষণ্ণ প্রভার মুখ!......তার চোখদুটিও যেন রুদ্ধ অশ্রুর ভারে ফুলে উঠেছে! সে মুখ দেখ্‌লে এখন একটি শিশুও তার প্রাণের কাতরতা বুঝতে পারে! আজ একটা-কিছু অঘটন ঘটেছে!

এতক্ষণ যা ভুলেছিলুম ফের সেই কথাটা হঠাৎ আমার মনে হয়ে গেল। প্রভার কাছেও কি আজ কেউ এসে সেই কুৎসিত ইঙ্গিত দিয়ে গেছে? আর তাই শুনেই কি সে এমন ব্যাকুল হয়ে পড়েছে? অসম্ভব নয়!

—"প্রভা, আজ কি তুমি কিছু দুঃখ পেয়েচ?"

প্রভা অল্প-একটুখানি ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে, "সংসারে যখন এসেচি

পুরন্দরবাবু, তখন সুখও পাচ্চি দুঃখও পাচ্চি—এ ত নিত্যকার ঘটনা! সুতরাং এ-কথা আর নতুন করে' জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

প্রভার কথার ভঙ্গি দেখে আমার সন্দেহ আরো ঘনিয়ে উঠল। বল্লুম, "তুমি কি শুনেচ বল প্রভা, আমার কাছে কিছু লুকিও না।"

—"না, আপনার কাছে আজ আমি আর কিছুই লুকবো না। এতক্ষণে বসে আমি সেই কথাই ভাবছিলুম।"

—"তবে বল, কি শুনেছ?"

—"কিন্তু শোনাশুনির কথা আপনি কি বল্‌চেন? কী আমি শুনেচি?"

একটু ইতস্তত করে' শেষটা আমি বলে ফেল্লুম, "তোমার-আমার সম্বন্ধে একটা কুৎসিত কথা পাড়ার কেউ এসে কি তোমাকে বা বিনোদকে বলে' গেছে?"

প্রভা সচমকে বলে' উঠল, "কুৎসিত কথা? কি কথা? কৈ, আমি ত কিছুই শুনি-নি?" একটু থেমে, সে আবার বল্লে, "বুঝেচি। কিন্তু ও-রকম কথা পাড়ার অলস লোকেরা বরাবরই রটিয়ে থাকে, সে-সব আমি গ্রাহ্যই করি না, আর সেজন্যেও আজ আমার মনে কোন কষ্ট হয়-নি। কিন্তু—"

—"থাম্‌লে কেন প্রভা?"

প্রভা শূন্যদৃষ্টিতে চাঁদের দিকে মুখ তুলে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বল্লে, "পুরন্দরবাবু, আজ্‌কের এই চাঁদের আলো দেখে কারুর হয়ত মনেই পড়বে না যে, এ-জগতে কত-বড় এক অন্ধকার আছে! এই চাঁদের আলো যেমন সত্য, সেই অন্ধকারও তেম্‌নি

সত্য! এ-কথাটা বারবার ভুলে যায় বলেই বোধহয় মানুষ এত কষ্ট পায়!"

—"কিন্তু, তুমি আমাকে কি বল্‌বে বল্‌ছিলে? সেই কথাই আগে বল।"

—"হ্যাঁ, সেই কথাই ত বল্‌চি। জানেন পুরন্দরবাবু, পূর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাও গাছের পাতার উপর-দিকেই পড়ে, পাতার তলায় অন্ধকার যেমন নিবিড় তেমনি নিবিড়ই থাকে?"

প্রভা আজ হঠাৎ নতুন মানুষের মতন কথা কইছে কেন? তার হোলো কি? আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লুম, "প্রভা, আজ তুমি এমন—"

—"আপনি ভাব্‌চেন বোধ হয়, আমার কথাগুলো ঠিক সহজ মানুষের কথার মত শোনাচ্চে না? তাই হবে। এতদিন ধরে আমি প্রাণপণে সহজ মানুষের মতই থাক্‌তে চেষ্টা করেচি, কিন্তু আমার চেষ্টা যে বিফল হোলো, তার জন্যে আমি দোষী নই!......এতদিন পরে অভাগী আমি, বেশ বুঝতে পারচি, ঐ চাঁদের আলো কেবল আমার বুকের উপরেই পড়বে—পৃথিবীর চোখকে মিছে মায়ায় ভুলিয়ে! আমার বুকের ভিতরে কী যে অন্ধকার, তা কি কেউ আর দেখতে পাবে?"

—"প্রভা, এ-সব কি শুন্‌চি? আমি ত কিছুই বুঝতে পারচি না।"

—"আচ্ছা পুরন্দরবাবু, রমণী-জীবনের চেয়ে অনির্দ্দিষ্ট জীবন আর কিছু আছে কি?"

—"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কর্‌চ?"

—"কারণ, এ জিজ্ঞাসার কোন উত্তর আমি নিজের কাছে পাই-নি! বাজার-থেকে-কিনে-আনা মাটির একটা তুচ্ছ প্রাণহীন খেলনার সার্থকতা

যেমন শিশুর পছন্দ-অপছন্দের উপরে নির্ভর করে, আমাদের নারীজাতির জীবনটাও অবিকল তেম্‌নিধারা! বিবাহের পর স্বামীর যদি পছন্দ হোলো, তবেই আমরা বাঁচলুম, নইলে—নইলে—" বল্‌তে বল্‌তে প্রভা একেবারে থেমে পড়ল।

………এতক্ষণ আমি যেন একটা গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম—এইবার অকস্মাৎ পথ খুঁজে পেলুম! প্রভার মনের মাঝে যে একটা চাপা দরদ আছে, এ-কথা আমি অনেকদিন আগেই বুঝেছিলুম, কিন্তু তার কারণ বুঝতে পারি-নি। আজ প্রভার কথাবার্ত্তা শুনে আমার মনে হঠাৎ একটা ইঙ্গিত জেগে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "প্রভা, বিনোদ কি তোমাকে অবহেলা করে?"

প্রভা পরিষ্কার স্বরে জবাব দিলে, "হ্যাঁ।"

—"বল কি প্রভা?"

—"বিবাহের পর থেকে স্বামীর আদর একদিনও পাই-নি, সে অবহেলা অনাদরও নীরবে সয়ে ছিলুম, কিন্তু আজ তিনি আমার গায়ে হাত তুলেছেন!"

—"তোমার গায়ে হাত! বিনোদ কি স্ত্রীলোকের গায়ে—"

—"কিন্তু তাঁর প্রহারকেও উপহারের মত আমি হাসিমুখে নিতে পারতুম, স্বামীর ভালোবাসা পাওয়া আমার কপালে যদি একদিনও ঘট্‌ত!……পুরন্দরবাবু, বলুন এমন জীবন নিয়ে আমি কি করব, কি-ক'রে আমি বেঁচে থাক্‌ব? আজীবন কেউ কি ব্যর্থতার সঙ্গে যুঝ্‌তে পারে? যুঝে যুঝে আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি—আর আমার শক্তি নেই, আর আমি পারি না!"

প্রভার এই মর্ম্মভেদী কাতরতা আমার বুকের ভিতরটা যেন তোলপাড় করে তুললে,—আমি আর একটিও কথা কইতে পারলুম না!

প্রভা খুব আস্তে-আস্তে বললে, "এ দুঃখের কথা, আপনি একদিন জিজ্ঞাসাও করেছিলেন, তবু আমি বলতে পারি-নি! কিন্তু স্বামীর ঘৃণা আজ এমন চরমে উঠেচে যে, নিজেকে আর আমি সামলে রাখতে পারচি না! আপনি আমার বন্ধু, বলুন, আমার এখন উপায় কি?"

—"কি বলব প্রভা, তোমার কথা শুনে আমি ত আর কথা কইবার ভাষা খুঁজে পাচ্চি না! ভিতরে ভিতরে এমন যে ব্যাপার চলচে, এতটা ত আমি কল্পনাও করি-নি!"

—"আপনি যা কল্পনা করতেও পারেন নি, আমার জীবনে নিশিদিন তা সত্য হয়ে জেগে আছে! স্বামী আমায় স্পষ্ট করে বলেছেন, আমাকে তিনি চান না—একেবারে না!"

—"তুমি বিনোদকে এত ভালোবাসো, আর সে তোমাকে—"

বাধা দিয়ে প্রভা বললে, "পুরন্দরবাবু, স্বামীকে আমি ভালোবাসি না!"

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

প্রভা বললে, "হ্যাঁ, ভালোবাসবার অনেক অবসর আমি খুঁজেচি, কিন্তু সে অবসর তিনি ত আমাকে দেন-নি পুরন্দরবাবু! আমি প্রাণপণে তাঁর সেবা করেচি, তাঁর প্রতিদিনকার নিষ্ঠুর ব্যবহার তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দিয়েচি, তাঁর সমস্ত ঘৃণা-বিরক্তিও আমাকে হতাশ করতে পারে-নি, তবু আমি ছায়ার মত তাঁর পিছনে পিছনে ছুটেচি, কুকুরের মত তাঁর পায়ে পড়ে' তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি জানিয়েছি,—সামান্য একটু হাসির

জন্যে, দুটো মিষ্টি কথার জন্যে, এতটুকু ভালোবাসার জন্যে, আমি তাঁর পথের উপরে গিয়ে ধুলোর মত গড়াগড়ি দিয়েছি,—কিন্তু সব মিছে হয়েছে, সব ব্যর্থ হয়ে গেছে! পাষাণ-মন্দিরের পাষাণ দেবতাও আমার সে প্রাণ-পণ আত্মনিবেদনে তাঁর পাথরের মুখ তুলে চাইতেন! কিন্তু আমার স্বামীর অটলতা একদিনের—এক মুহূর্ত্তের জন্যেও একটুও টলে-নি—তিনি বারবার সেই এক-কথাই বলেছেন,—আমাকে তিনি ভালোবাসেন না, কখনো বাসবেনও না!.........সুধু তাই নয় পুরন্দর-বাবু, আজ কয় মাস ধরে, এখানে এসে পর্য্যন্ত তিনি যেন আরো কঠিন হয়ে উঠেচেন, দিন-রাত সমস্তক্ষণ সে কঠিনতার সাম্‌নে অধীর না হয়ে বসে থাকা, মানুষের পক্ষে অসম্ভব! তাঁর সেই নির্ম্মম, বুক-পোড়ানো ব্যবহারে অনেকদিন থেকেই আমার মন তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে আছে, তাঁকে যে এতদিন আমি একে-বারে ত্যাগ করে' চলে যাই নি—এ খালি কর্ত্তব্যের জন্যে। কিন্তু এমন নিঃসম্বল হয়ে আমি ত আর কর্ত্তব্যপালনও করতে পার্‌চি না! বলুন, এমন করে কতদিন আর সইতে পারা যায়? আমার এ জীবন ত মানুষের জীবন বটে! এ ত পরের-হাতে-চলা, একটা কলের যন্ত্র নয়! জ্বলে-পুড়ে বুক যে আমার খাক্ হয়ে যাচ্ছে! এ যে অসহ্য—অসহ্য! আমারও প্রাণ আছে, যৌবন আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে! আমি মানুষ—এই সুন্দর পৃথিবীতে আমি ব্যর্থ হ'তে চাই না, আমি বাঁচতে চাই,—আমি বাঁচতে চাই! আপনার মত আত্মীয় আমার আর কেউ নেই...কি কর্‌লে আমি মুক্তি পাব, আপনিই আমাকে বলে' দিন!"

—"প্রভা! তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?"

—"আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারচেন না? আমি মুক্তি চাইছি

—মুক্তি! স্বামীর নিষ্ঠুরতা আর আমি সহ্য করতে পারছি না—, আপনার কাছে আমি মুক্তি চাইছি!"

—"আমার কাছে?"

প্রভা আমার দিকে তার হঠাৎ-জ্বলন্ত চোখের উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে, অত্যন্ত স্থির স্বরে বল্‌লে, "হ্যাঁ, আপনার কাছে!"

—"প্রভা! প্রভা——"

—"আজ এই কথা বল্‌বো বলেই আমি প্রস্তুত হয়ে আছি। আপনার সঙ্গে প্রথম যেদিন আমার দেখা হয়, সেইদিন থেকেই আমার মনের গতি ফিরিয়ে গিয়েছে। এমন ভাবে গোপনে মনের গতি হয়ত অনেকেরই ফেরে, কিন্তু হয়ত তা বাইরে কথনো প্রকাশ পায় না! আমিও আমার এ গোপন কথা চিরদিনই গোপন রাখব ভেবেছিলুম, কিন্তু নিরাশার শেষ সীমায় এসে এখন বুঝচি, এ গুপ্ত কথা প্রকাশ না করলে আমি আর বাঁচবো না! আমি—"

প্রভার এই অভাবিত আত্মপ্রকাশে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম!

কোথা থেকে একখানা কালো মেঘ এসে চাঁদের মুখ ঢেকে দিলে—অন্ধকারের একখানা যবনিকা এসে চারিদিক ঝাপ্‌সা করে' তুল্‌লে।……

সেই স্বচ্ছ আঁধারে আচম্বিতে কে আমার বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কার দুখানি হাত এসে এক নিমেষে আমার বক্ষ বেষ্টন করে' ধরল—সঙ্গে-সঙ্গে কে আমার মুখের উপরে মুখ রেখে আকুল ভাবে চুম্বনের উপর চুম্বন করতে লাগ্‌ল!

………উঃ! কী জ্বালা! আমার মুখ যে পুড়ে গেল—পুড়ে গেল! সর্পাহতের মত আর্ত্তনাদ করে' কাতরস্বরে আমি বলে' উঠলুম, "প্রভা,

জনতা! তোমাদের নারীত্বকে আমি পূজা করি, নারীত্বের উপরে আমার অবিশ্বাস করিয়ে দিও না!—তোমার এই চুম্বনকে আমি গ্রহণ করলুম,—সন্তানের মুখে জননীর চুম্বনের মত!"

দশ

বিনোদের কথা

ভগবান বলে' সত্যিই যদি কোন সৃষ্টিকর্ত্তা থাকেন, তবে আমাকে তিনি যে একটা নূতন উপাদানে সৃষ্টি করেছেন, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আর-পাঁচজনের মত আমিও যদি সাধারণ মানুষ হতুম, তাহলে সে রাত্রে ছাদের উপরকার সেই স্মরণীয় দৃশ্য দেখে আমি অমন শান্ত ও স্তব্ধ হয়ে থাক্‌তে পারতুম না! না, আমি সাধারণ মানুষ নই—আর,……এজন্যে আমি গর্ব্বিত!

তেমন দৃশ্য যে দেখতে হবে, এ আমি আগে থাক্‌তেই জানতুম। অভিনয়ের কোথায় কি ভাবের বিকাশ হবে, কোথায় কি সাজ-সজ্জা, কি দৃশ্যপট হবে, রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ সে-সব কথা আগে-থাক্‌তেই জেনে রাখে; কারণ, তাকে আপন হাতেই অভিনয়ের উপযোগী সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্দোবস্ত গুছিয়ে-গাছিয়ে ঠিক করে' রাখতে হয়। তাই প্রতি রাত্রে নিত্য-নূতন দর্শকের দল যখন অভিনয়ের আকস্মিক ও বিচিত্র ভাবে অভিভূত, উত্তেজিত ও চমৎকৃত হয়ে ওঠে, রঙ্গালয়ের কর্ত্তা তখন কিছুমাত্র বিস্মিত ও ভাবাপ্লুত হয় না। এ ত তার নিজের হাতে সাজানো-গুছানো, এ ত হবেই,—এ না হওয়াই ত আশ্চর্য্য!

সুতরাং সেই জ্যোৎস্না-রাত্রে ছাদের উপরে প্রেমের লীলা দেখে, আমিও কিছুমাত্র বিস্মিত হই-নি! নিজের হাতেই আমি জমি তৈরি করেছি, ফাঁদ পেতেছি, সব বন্দোবস্ত ঠিক করেছি,—আমার এত চেষ্টা-যত্নের আয়োজন ত বিফল হ'তে পারে না,—আমি যে এতদিন ধরে এই মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করে'ই একাগ্রমনে বসেছিলুম!

একদিকে অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, প্রেমহীন স্বামী; আর এক-দিকে সুপুরুষ, সদালাপী, সহৃদয় বন্ধু;—মাঝখানে অতৃপ্ত, অসুখী ও উপেক্ষিতা যুবতীর নিরানন্দ জীবন! পাত্রপাত্রীর সমাবেশ যদি এমনধারা হয়, তবে এই ত্রিধারার পরিণাম কি, সেটা বোঝা একটুও শক্ত নয়।

পরিণামের দিকেই দৃষ্টি স্থির রেখে একান্তভাবে আমি কাজ করে' যাচ্ছিলুম। এখন আমি বুঝতে পারছি, দুরাচার স্বামীর ভূমিকায় আমি যে-কোন প্রথমশ্রেণীর নটের চেয়ে খারাপ অভিনয় করি-নি। আমার অভিনয় যে সার্থক হয়েছে, এইটেই তার জলন্ত প্রমাণ!

কিন্তু এখনো আমার হাতে অনেক কাজ বাকি আছে। আমার চক্রান্তের প্লটের প্রথম পরিচ্ছেদ হচ্ছে, 'আমার কপটতায় ভুলে পুরন্দরের পরাজয়'। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্ত্রীকে প্রায় পোষ মানিয়েছি। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমার অভিনয়ে পুরন্দর ও প্রভার পতন হলো—কিন্তু এখনো যে অনেক পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ করতে হবে!......

ইতিমধ্যেই আমি আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে অনেকটা অগ্রসর হয়েছি।......সে রাত্রে ছাদের একপাশে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে, প্রভা ও পুরন্দরের কথা খানিকক্ষণ শুনবার পরই মনে হোলো, আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এতদিন যে ফাঁক খুঁজছিলুম, সেই ফাঁক আজ আমি

পেয়েছি! তখনি নেমে এসে, তাড়াতাড়ি আমি পুরন্দরের বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলুম। উপরে উঠে দেখলুম, শ্রী একলাটি বসে বসে পাণ সাজছে।

আমাকে দেখে সে বল্‌লে, "ঠাকুর-পো!—এমনসময়ে যে?"

আগে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম। না, কেউ কোথাও নেই। তবু গলাটা যথাসম্ভব খাটো করে' বললুম, "বৌদি, আমার বন্ধু হয়েও তোমার স্বামী আমাকে এমন দাগাটা দিলেন! এ আমি স্বপ্নেও ভাবি-নি!"

শ্রী ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে' আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্‌লে, "কি বল্‌চ ঠাকুরপো?"

—"না, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি-নি! ওঃ, বন্ধু হয়ে এমন ব্যবহার!"

শ্রী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য্য স্বরে বল্‌লে, "কেন ঠাকুরপো, উনি কি করেচেন?"

—"কি করেচে? পুরন্দর আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিতে চায়!"

ঘাড় তুলে ক্রুদ্ধ, তিরস্কারের স্বরে শ্রী বলে' উঠ্‌ল,—"ঠাকুরপো!"

—"তুমি রাগ কর্‌চ বৌদি? হ্যাঁ, এ বিশ্বাস কর্‌বার কথা নয়! আমি স্বচক্ষে দেখেও এখনো বিশ্বাস কর্‌তে পারচি না—যা দেখেচি, যা শুনেচি সব সত্য কিনা!"

—"ঠাকুরপো, তোমার কথা আমি বুঝতে পারচি না। স্বচক্ষে তুমি কি দেখেচ?"

—"যা আমি দেখেচি, ইচ্ছে করলে তুমিও তা দেখতে পার। তোমাদের ছাদে উঠ্‌বার সিঁড়ি আছে ত?"

—"হ্যাঁ আছে।"

—"তবে এস আমার সঙ্গে।"

আজ পূর্ণিমার রাত, এ-বাড়ীর ছাদের পাশেই আমাদের ছাদ, সমস্ত দৃশ্য ঠিক দিনের বেলার মতই স্পষ্ট দেখা যাবে!

আমার পিছনে পিছনে শ্রী তাদের ছাদের উপরে গিয়ে উঠল।...... কিন্তু, কি বিপদ! কোথা থেকে একখানা মেঘ এসে চাঁদকে ঢেকে ফেলেছে, চারিদিক একেবারে অন্ধকার হয়ে না গেলেও, কেমন আব্‌ছায়ার মত ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে।

শ্রী বল্‌লে, "কৈ ঠাকুরপো, কি দেখাবে বলেছিলে দেখাও!"

আমাদের ছাদের দিকে চেয়ে দেখলুম। পুরন্দর আর প্রভাকে দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু চেনবার যো নেই—ভারি অস্পষ্ট।

—"বৌদি, আমাদের ছাদের দিকে চেয়ে দেখ। কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ কি?"

—"হ্যাঁ, কারা যেন নড়্‌চে-চড়্‌চে। ওরা কে?"

—"এখনি দেখতে পাবে। মেঘটা সরে যাক্‌।"

.........আস্তে আস্তে চাঁদের উপর থেকে মেঘখানা কেটে গেল—চারিদিক আবার আলোয় আলো!

যতখানি দেখ্‌ব মনে করেছিলুম, তার চেয়ে ঢের-বেশী দেখলুম!...... পুরন্দর আপনাকে প্রভার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিচ্ছে!

একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে' শ্রী সেইখানেই বসে পড়ল!

পাছে ওরা দেখে ফেলে, সেই ভয়ে শ্রীকে তাড়াতাড়ি চিলের ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে এলুম।

ঘরের ভিতর থেকে শ্রী পাগলের মত আবার বাইরে ছুটে যেতে গেল। দরজার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমি বাধা দিলুম।

শ্রী আকুল স্বরে বলে' উঠল, "ওগো আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আবার দেখ্‌ব—আমি আবার দেখ্‌ব! নিশ্চয় আমি ভুল দেখেচি—এ হ'তে পারে না! আমার স্বামী—আমার স্বামী—না, এ হ'তে পারে না—আমি ভুল দেখেচি!"

—"বৌদি, তুমি ভুল দেখনি, যা দেখ্‌লে তা সত্য!"

আমাকে দু-হাতে ঠেলে দিয়ে সে বল্‌লে, "না, তুমি মিছে কথা বল্‌চ··· সব মিছে কথা! সরে যাও—তুমি সরে যাও! নৈলে আমি এইখান থেকেই চ্যাচাব!"

—"বৌদি, অমন করো না, ঠাণ্ডা হও! তুমি সব দেখেছ, এ-কথা জান্‌তে পার্‌লে পুরন্দর হয়ত আর বাড়ীতেই ফির্‌বে না—আমার স্ত্রীকে নিয়ে একেবারে দেশান্তরী হয়ে যাবে।"

শ্রীর মত স্ত্রীলোককে কোন্‌দিক থেকে ঘা মার্‌লে বশ করা যায়, তা আমি বেশ বুঝে নিয়েছিলুম। আমার কথা শুনে, স্বামীকে একেবারে হারাবার ভয়ে শ্রী তখনি অনেকটা শান্ত হয়ে পড়ল। আচ্ছন্নের মত অবশ হয়ে মাটির উপরে বসে, দু-হাতে মুখ ঢেকে সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

আমি তাকে খানিকক্ষণ কাঁদবার অবকাশ দিলুম।······

তারপর ধীরে ধীরে বল্‌লুম, "বৌদি, এখন অস্থির হবার সময় নয়, মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধীরে-সুস্থে বুঝে-সুঝে সব কাজ কর্‌তে হবে। উপস্থিত তোমারও যে দশা, আমারও সেই দশা। তুমিও তোমার স্বামী হারাতে বসেচ, আমিও আমার স্ত্রী হারাতে বসেচি। তবু দেখ, আমি একটুও অস্থির হই-নি।"

শ্রী আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে গাঢ় স্বরে বল্‌লে, "ওগো, তোমরা পুরুষ-মানুষ, এ পৃথিবীতে নিজের স্ত্রী ছাড়া তোমাদের আরো অনেক আনন্দ আছে—স্ত্রীর সঙ্গে-সঙ্গে তোমাদের জীবনের সকল আশা ত চলে যায় না! কিন্তু স্বামী হারালে আমরা আর কার মুখ-চেয়ে বেঁচে থাক্‌ব ঠাকুর-পো?"

স্বামীকে হারাবার ভয়ে শ্রীর এতটা আকুলতা আমার ভালো লাগল না! কিন্তু মনের ভাব মনেই লুকিয়ে মুখে আমি বললুম, "কিন্তু স্বামীকেই-বা তুমি হারাবে কেন—"

বাধা দিয়ে শ্রী বলে' উঠ্‌ল, "হারাব না? চোখের উপরে আজ যা দেখলুম, তারপরেও স্বামীর কাছে আমি আর কি আশা কর্‌তে পারি? স্বামীর সঙ্গে আর কি-বলে' আমি কথা কইব, কেমন করে' ভালো মনে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াব, তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি হ'লে লজ্জায়-ঘৃণায় আমারি যে মাথা কাটা যাবে! মাগো, আমার কপালে শেষে এই ছিল—" শ্রী আবার কান্না জুড়ে দিলে!

—"কেঁদনা বৌদি, কেঁদনা! তোমার স্বামী যাতে আবার তোমারি হন, আমি প্রাণপণে তা কর্‌ব!"

—"কর্‌বে? কি-করে কর্‌বে ঠাকুরপো?"

শ্রীর কথার জবাব দিতে যাব—নীচে থেকে হঠাৎ পুরন্দরের গলা পেলুম। এরি মধ্যে তার প্রেমের লীলা সাঙ্গ হয়ে গেল!—আশ্চর্য্য! তাড়াতাড়ি বল্‌লুম, "চোখের জল মুছে ফেল বৌদি, পুরন্দর এসেচে! সাবধান, সে যেন কিছুই টের না পায়, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই তাকে হারাবে! আমার ওপরে নির্ভর করে' থাক, পুরন্দরের মন যাতে ফেরে,

তার উপায় কাল্‌কেই আমি তোমায় করে' দেব। হতাশ হোয়ো না— পুরন্দরকেও কিছু বোলো না!"

—আজ থেকে আমি শ্রীর কাছে মরমী বন্ধু হয়ে গেলুম। আমার যুক্তি-পরামর্শ এখন থেকে তার কাছে অকাট্য হবে। এই ত আমি চাই!

এগারো

শ্রীর কথা

আমার কপাল পুড়েছে গো, আমার কপাল পুড়েছে! এতদিন অষ্ট-প্রহর যে ভয় করতুম, তাই আজ ফলে' গেল!

কিন্তু আমার স্বামী যে এতটা এগুতে পারেন, এমন সন্দেহ ত কোন-দিন আমি মনের কোণেও ঠাঁই দিই-নি! আমি ভাবতুম, মন ওঁর চঞ্চল হ'লেও আমাকে উনি ভালোবাসেন! কিন্তু ওঁর ভালোবাসা যে আমাকে ভুলিয়ে রাখ্‌বার জন্যে, এ কে জান্‌ত বল!

এত দিন এত বছর একসঙ্গে বাস করলুম, নিজের স্বামীকে তবু চিন্‌তে পারিনি! সখীদের কাছে কতবার গর্ব্ব করে' বলেছি, 'আমার স্বামীর মত স্বামী আর কারুর হবে না!' হা রে অদৃষ্ট, আমার গর্ব্ব কি এম্‌নি করে'ই ভেঙে দিতে হয়!

কিন্তু না, স্বামী বোধহয় আমাকে ভালো বাস্‌তেন!…ঠাকুরপোর ঐ পোড়ারমুখী প্রভাই হয়ত নিজের মুখ পুড়িয়ে আবার আমার কপাল পোড়াতে বসেছে! মনে পড়ে, একদিন ওঁকে আমি বলেছিলুম, 'আগুনের

কাছে থাক্‌লে ঘি না গলে' থাক্‌তে পারে না,'—সেদিন আমার কথা উনি হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন, অথচ আমার সেই কথাই আজ সত্যি হ'ল! যে-সব মেয়ে মুখে ঘোমটা দেয় না, দশজনের বুকের উপর দিয়ে জুতো পরে' পথ হাঁটে, পরপুরুষের সঙ্গে অনায়াসে হাসে, গায়, গল্প করে, তারা মেয়ে নয়, তারা ডাইনি, তারা মায়া জানে—তাদের পাল্লায় পড়্‌লে পুরুষের সাধ্যি কি ঠিক থাক্‌তে পারে! পুরুষের পল্‌কা মন, একটুতেই নুয়ে পড়ে যে! রামায়ণ-মহাভারতে পড়েছি, ডাইনির মায়ায় কত বুড়ো বুড়ো মুনি-ঋষিরও আজন্ম-তপস্যা মিছে হয়ে গেছে, আর আমার স্বামী ত সামান্য মানুষ, তাঁকে ভোলানো ত খুবই সহজ!

হ্যাঁগো, বুঝেছি, বুঝেছি—এ-সব ডাইনির মায়া, নিশ্চয় ওষুধ খাইয়ে আমার স্বামীকে ও-ছুঁড়ী বশ করেছে—নইলে এত সহজে আমার ভালো-বাসা ভুলে যান! আমার স্বামী যে মাটির মানুষ, মহাদেবের মত ওঁর সরল প্রাণ, ছেলেবেলায় শিব-পূজো করে' শিবকেই আমি যে স্বামীরূপে পেয়েছি—ওঁর ত কিছু দোষ নেই! ঐ প্রভাই যত নষ্টের গোড়া, আমার এমন স্বামীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ও-কিনা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়! এ কথা মনে কর্‌লেও বুক কেঁপে ওঠে,—আমি ত কিছুতেই ওঁকে ছাড়্‌ব না, ওঁর পায়ের তলায় মাটি আঁক্‌ড়ে আমি মুখ গুঁজে পড়ে থাক্‌ব, ডাইনির গ্রাস থেকে জোর করে' ওঁকে ছিনিয়ে আন্‌ব—আমার স্বামীকে আবার আমার কর্‌ব! স্বামীর যাতে অধর্ম্ম না হয়, কায়মনোবাক্যে স্ত্রীর ত তাই করা কর্ত্তব্য, স্ত্রী ত সুধু স্বামীর খেলার পুতুল নয়—স্ত্রী যে স্বামীর ধর্ম্মপথের সঙ্গী!

হে মা দুর্গা, আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখ, আমার মনে জোর

দাও, আমি যেন স্বামীর মতি-গতি আবার ফেরাতে পারি, আমার শিব-পূজো যেন সত্যি হয় মা, আমার স্বামী যেন কু-পথে না যান!

সবিত্রী যমের মুখ থেকে সত্যবানকে কেড়ে এনেছিলেন, আর আমি কি এই কাজটাও কর্‌তে পার্‌ব না? কেন পার্‌ব না—স্বামী আমার ধ্যান-জ্ঞান, স্বামী আমার প্রাণ—তাঁকে বৈ আমি ত আর কারুকে জানিনা চিনিনা, আগে তাঁর নাম না নিয়ে আমি যে সন্ধ্যা-আহ্নিক পর্য্যন্ত করি না! এ আমি পার্‌ব পার্‌ব পার্‌ব—স্বামীকে আবার আমি সুপথে আন্‌তে পার্‌ব—এও যদি না পারি তবে এ মিছে জীবন আর রাখব না, আমি মর্‌ব—বিষ খেয়ে মর্‌ব!

ঠাকুরপো ঠিক কথাই বলেছেন, আমি যে সমস্ত দেখেছি জেনেছি, এ কথা ওঁকে জান্‌তে দেওয়া হবে না! ডাইনির মায়ায় এখন উনি পাগল হয়ে গেছেন, ওঁকে লজ্জা দিলে এখনি উনি বেঁকে দাঁড়াতে পারেন! তার চেয়ে কিছু না-বলাই ভালো। আগে ওঁর মনটা ঠিক ক'রে বুঝি তার পর ঠাকুরপো কি উপায় করেন দেখি, তারপর সব দিক বুঝেসুঝে যা করা উচিত, তাই কর্‌ব।……

সেদিন ঠাকুরপো যখন চলে' গেলেন, একা বসে বসে এই-সব কথা আমি ভাবতে লাগ্‌লুম।

হঠাৎ শুন্‌লুম, নীচে থেকে স্বামী ডাক্‌ছেন, "শ্রী! শ্রী!"

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম। ছাদের দরজার কাছে গিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখলুম, ও-বাড়ীর নির্জ্জন ছাদে প্রভা তখনো একলা উপুড় হয়ে পড়ে আছে! ও পোড়ারমুখী অমন করে' শুয়ে আছে কেন? ঘুমুচ্ছে বুঝি?

ও ছুঁড়ী হতচ্ছাড়ীকে দেখে আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠ্ল। ইচ্ছে হ'ল, এখনি ছাদের আল্সের কাছে ছুটে গিয়ে ওকে ডেকে বলি, তোর ও-কালা মুখ আর কারুকে দেখাস্নে লো, দেখাস্-নে, তুই মর্লে বাসুকীর মাথার ভার কমে যাবে, নরকেও তোর ঠাঁই নেই!

নীচে থেকে আবার ডাক্ এল, "শ্রী! শ্রী! তুমি কোথায়?"

নীচে নেমে এলুম। কিন্তু স্বামীর কাছে যেতে পা যেন উঠছিল না—যে ভয়ানক দৃশ্য দেখেছি, এখনো আমার সমস্ত প্রাণ আড়ষ্ট হয়ে আছে, কি-করে, সব লুকিয়ে সহজ মানুষের মত আবার ওঁর সঙ্গে কথা কইব! স্বামীর সঙ্গে ত এমন লুকোচুরি করা কোনদিন আমার অভ্যাস নেই। মনে এক মুখে আর, এ ত' কোনদিন শিখিনি!

—"শ্রী, এত ডাকৃচি তবু সাড়া দিচ্চ না কেন?"

—"এই যে যাচ্চি" বলে মনের সব ইতস্তত ঘুচিয়ে আমি ঘরে ঢুকে পড়্লুম।

স্বামী বিছানায় শুয়েছিলেন, আমাকে দেখে বল্লেন, "বড় তেষ্টা পেয়েছে, এক গেলাস জল দাও।"

কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

স্বামী আস্তে আস্তে উঠে আমার হাত থেকে জলের গেলাসটা নিলেন। তারপর গেলাসটা হাতে করে', জল না খেয়েই আমার মুখের পানে একদৃষ্টিতে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। আমি কিন্তু তাঁর দিকে তাকাতে পারলুম না, চুপ করে' মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।······

হঠাৎ সেই জলসুদ্ধ গেলাসটা স্বামীর হাত থসে মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল! আমি চম্‌কে মুখ তুল্‌তে না তুল্‌তেই, আচম্বিতে স্বামী আমাকে

দুহাতে টেনে নিয়ে একেবারে তাঁর বুকের মধ্যে চেপে ধর্‌লেন!······সে কী নিবিড় আলিঙ্গন, মনে হ'ল এমন করে' আর-কখনো আমাকে তিনি তাঁর বুকে ঠাঁই দেন নি! তাঁর এই গভীর প্রেমের আবেগে আমার প্রাণের ভিতরটা যেন উথ্‌লে উঠ্‌ল, কোথা থেকে অশ্রু এসে দু-চোখ আমার ভরে দিলে, তাঁর বুকে মাথা রেখে মন আমার কৃতার্থ হয়ে বল্‌তে লাগল, "এই বুকে, এম্‌নি করে, আমি যেন এখনি মরে যাই—এখনি মরে যাই গো, এখনি মরে যাই!"

আমার মাথার উপরে তাঁর মুখখানি কাৎ করে' রেখে, নিস্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ তিনি বসে রইলেন; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে আধ-ফোটা স্বরে বল্‌লেন, "শ্রী, আমাকে তুমি ভালোবাসো?"

—স্বামীর মুখে এমন ছেলেমানুষী প্রশ্ন আর-কখনো শুনি-নি! তাঁর স্বরও আজ যেন নতুন মানুষের মত বোধ হচ্ছিল! আমি অবাক হ'য়ে গেলুম!

তিনি আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "শ্রী, আমাকে তুমি ভালোবাসো?"

—"হ্যাঁগা, এ কথার কি উত্তর আছে? তুমি কি তা জান না?"

—"ভালোবাসো?"

—"তোমাকে আমি ইষ্টদেবতার মত ভক্তি করি, ভালোবাসি।"

—"হ্যাঁ, ভালোবাসো শ্রী, প্রাণপণে আমাকে ভালোবাসো—তোমার ভালোবাসা থেকে কখনো আমাকে মুক্তি দিও না, তোমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তুমি আমাকে আচ্ছন্ন করে' থাকো, সাবধানে আমাকে আগ্‌লে রাখো!" —অধীর স্বরে এই কথাগুলি বলে' স্বামী আমাকে আরো-জোরে তাঁর বুকের ভিতর চেপে ধর্‌লেন!

স্বামী কি তাঁর ভুল বুঝে অনুতপ্ত হয়েছেন? গোপনে চোখের জল মুখে এতক্ষণ পরে আমি মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইলুম। তাঁর মুখ দেখে বিশেষ-কিছু বুঝতে পারলুম না—কেবল তাঁর চোখদুটি কেমন যেন ব্যথা-ভরা বলে' মনে হ'ল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি আজ এ-সব কথা বলচ কেন? আজ তোমার কি হয়েচে গা?"

কেমন অন্যমনস্কের মত তিনি বললেন, "শ্রী, এ সংসারের পথে লুকনো কাঁটা আছে, আমি ত তা জানতুম না! এ পথে চলতে এখন আমার ভয় করচে, আমার মন একেবারে ভেঙে গেছে।"

স্বামীর দু-হাত চেপে ধরে আমি বললুম, "তোমার কথা আমি বুঝতে পারচি না! নিশ্চয় আজ কিছু হয়েচে! কি হয়েচে, আমাকে বলবে না?"

তিনি চমকে উঠলেন! তাঁর মুখ ম্লান হয়ে গেল! সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে চেয়ে গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, "না, কিছু হয় নি! শরীরটা আজ ভালো নয়—তুমি খাওয়াদাওয়া করে' নাওগে যাও, আমি আজ খাব না!"...বলেই তিনি আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন!

স্বামী আমাকে কিছু বলতে চান না! আমার মন আবার ভাবনায় ভরে উঠল। আমাকে এত অবিশ্বাস? এমন লুকোচুরি ত ভালো নয়!

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি কিন্তু একেবারে চুপচাপ।

কাল শেষ-রাত থেকে হঠাৎ ওঁর জ্বর হয়েছে।

ভোর না-হ'তেই ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠালুম।

ওঁকে দেখে-শুনে ওষুধের ব্যবস্থা করে', ঠাকুরপো আমাকে ইঙ্গিতে ডেকে বাইরে নিয়ে গেলেন।

একটা নির্জ্জন ঘরে গিয়ে ঠাকুরপো চুপিচুপি বল্‌লেন, "বৌদি, অনেক ভেবে আমি একটা উপায় ঠাউরেচি। পুরন্দরকে আমি একেবারে তোমার বশীভূত করে' দিতে পারি!"

আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম,"কি করে' ঠাকুরপো ?"

—"মনে পড়ে বৌদি, একদিন আমি তোমাকে বলেছিলুম, আমাদের ডাক্তারী-শাস্ত্রে এমন অনেক ওষুধ আছে যাতে মানুষের মন ফিরে যায়? —পুরন্দরকে আমি সেই রকম একটা ওষুধ দিতে চাই।"

আমার স্বামীর কাল্‌কে ব্যবহার মনে হ'ল। তাঁর সে আলিঙ্গনের নিবিড়তা এখনো আমার গায়ে লেগে আছে। তিনি যে এখনো আমাকে ভালোবাসেন, সেটাও কাল জান্‌তে পেরেছি। তবে……

কিন্তু না, বলা যায় না! মানুষের মন মেঘের মত হাল্‌কা, সে যে একটু বাতাসেরও ভর সয় না! মায়াবিনী এখনো জাল পেতে বসে আছে, ছাদের উপরে কাল স্বচক্ষে যে দৃশ্য দেখেছি, তা কি এত-শীঘ্র ভোলবার? মাথার উপরে যখন খাঁড়া ঝুল্‌ছে তখন কোন্‌দিন কিসে কি হয়, কে বল্‌তে পারে? সাবধানের মার নেই,—হাতের লক্ষ্মীও পায়ে ঠেল্‌তে নেই!

ঠাকুরপো বল্‌লেন, "কি ভাবচ বৌদি? তুমি কি আমার কথায় রাজি নও?"

—"কিন্তু ঠাকুরপো, কেউ যদি জান্‌তে পারে ?"

তাচ্ছীল্যের হাসি হেসে ঠাকুরপো বল্‌লেন, "জান্‌তে পার্‌বে আবার কে ? জান্‌ব খালি তুমি-আমি।"

"—কিন্তু ওষুধ খাওয়াতে গেলে উনি যদি টের পান ?"

—"কিছু ভেবো না, এ ওষুধ টের পাবার যো নেই। কাল্‌কে ছাদের উপরে সেই অভিনয়টা ক'রে' এসেই উত্তেজনায় পুরন্দরের অসুখ করেছে—এ অসুখে তোমারি সুবিধা হবে, বোধহয় ভগবান তোমার সহায়। অসুখের পথ্য বলে' আমি নিজের হাতে অ্যারারুট তৈরি করে' লুকিয়ে তোমার হাতে দিয়ে যাব, সেই অ্যারারুটটা তুমি পুরন্দরকে খেতে দিও। সেই অ্যারারুটেই ওষুধ মিশানো থাক্‌বে। আমার ওষুধের কোন রং, স্বাদ কি গন্ধ নেই, সুতরাং পুরন্দরেরও তাতে কোন সন্দেহ হবে না।"

—"কিন্তু ঠাকুরপো, আমার বড় ভয় কর্‌চে, শেষটা কি হ'তে কি হবে!"

—"হবে আবার কি ? অত যদি ভয় তোমার, তাহলে যা-খুসি কর, আমি চল্‌লুম।"

—"রাগ কোরো না ঠাকুরপো! আমি বল্‌চি, সে ওষুধে ওঁর আর-কিছু অনিষ্ট হবে না ত ?"

—"অনিষ্ট! অনিষ্ট আবার কি ? এ ওষুধে তোমার-আমার দুজনেরি লাভ। তুমিও স্বামীকে ফিরে পাবে, স্ত্রীর জন্যে আমারও কুলে কালি পড়বে না। বল, আমার কথায় তুমি রাজি আছ ত ?"

—"হ্যাঁ।"

বারো

প্রভার কথা

চলে গেলে, তুমি চলে গেলে গো,—আমার এই হতভাগ্য জীবনের গোপন প্রান্তে আশা-প্রদীপের এইটি যে শিখা জ্বলছিল, সে শিখা নিবিয়ে দিয়ে, মনকে আবার অন্ধকারে ডুবিয়ে!……হে প্রিয়তম, হে প্রিয়তম, তোমার মনের মূর্ত্তি যে এমন পাষাণে গড়া, এতদিন সে সত্য ত আমার চক্ষে পড়ে নি!

তবে কি আমি তোমার পূজার মন্ত্র জানি না? তাই কি তোমার পাষাণ-মূর্ত্তিতে আমি জীবন-প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পার্‌লুম না? এই বিফল পূজার ব্যর্থতা নিয়ে আমি কি তাহলে চিরকাল এম্‌নি জীবন্মৃত হয়ে থাক্‌ব?……না গো না,—সে কথা যে আমি ভাব্‌তেও পারি না—আশা দাও, আমাকে আশা দাও! নিভৃত প্রাণের গোপন দেবতা আমার,—ফিরে এস, ফিরে এস, ফিরে এস!

ওরে আমার প্রাণ, এতদিন কি ভুলে আত্মহারা হয়ে দিনের পর তুই দিন গুণছিলি? আজ তুই যে পরিণামে এসে দাঁড়িয়েছিস্, এর পর তোর আর কি কিছু কর্‌বার আছে? তোর সব শক্তি আজ ক্ষয় হয়ে গেছে, বিশ্বের বিষাক্ত দংশনে আজ তোর বুকের সমস্তটা রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে—তীরবিদ্ধ আহত সর্পের মত নিজেকে নিজেই ক্ষতবিক্ষত করে', নিষ্ফল আক্রোশে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আজ ত তোর আর ভিন্নগতি নেই!……

না! না! এ আমি কি ভাব্‌ছি!……তাঁর শেষ কথাগুলি আবার আমার কাণে বেজে উঠল। কী ভয়ানক সে কথা,—অথচ কত করুণ, কত কোমল, কত মমতা-ভরা! সে কথায় আমি আমার ব্যর্থ-বেদনার সীমা বুঝতে পেরেছি, আমার জীবনব্যাপী নিরাশার স্বরূপ মূর্ত্তি দেখ্‌তে পেয়েছি—কিন্তু সেই সঙ্গে এও জেনেছি যে, তাঁর কাছে আমি কত ক্ষুদ্র—জগতের শত শত অমানুষের ভিতরে কত বড়, কত মহৎ মানুষ তিনি! তাঁর এই কঠোর প্রত্যাখ্যানে হৃদয় আমার দুঃখের ভারে ভেঙে গেছে বটে, কিন্তু এ দুঃখ আমারি বক্ষ নিষ্পেষিত করুক—এর জন্য তাঁকে আমি আর যেন আঘাত না দি! এতদিন তাঁকে আমি মানুষের মত দেখ্‌তুম, আজ থেকে দেখ্‌ব দেবতার মত! নিজের দুর্ব্বলতায় ভেবেছিলুম, দুর্ব্বলতা তাঁর মধ্যেও আছে—তাঁর সেই কল্পিত দুর্ব্বলতাকে অন্ধের মত আমি ভালো বেসেছিলুম! আজ তিনি আমাকে দৃষ্টিদান কর্‌লেন, এখন দেখছি মানুষের দুর্ব্বলতাও তাঁর মধ্যে নেই, তাঁকে ভালো বাসবার অধিকারও আমার নেই! তা'হলে তাঁকে ত্যাগ কর্‌তেও আমি পার্‌ব না,—তিনি দেবতা, তাঁকে আমি শ্রদ্ধা কর্‌ব, ভক্তি কর্‌ব, পূজা কর্‌ব।

ওগো, আমার এ ভক্তি-পূজা তুমি গ্রহণ কোরো—আমার এ দুদিনের ভ্রম-প্রমাদকে তুমি চিরদিনের মনে কোরো না, আমার সমস্ত পাপ, সমস্ত হীনতা, সমস্ত প্রলোভনকে তুমি ক্ষমা কোরো! আমার মনের মাঝে পাপের সঞ্চার হয়েছে কবে কোন্‌দিন, তা আমি এখনো জানিনা, এ পাপ ত এসেছে আপনি, আমার অজ্ঞাতে, অনেক চেষ্টা ক'রেও আজ আমি একে আর চেপে রাখতে পারলুম না—ক্ষণিক অসাবধানতার সুযোগ পেয়ে তাই সে আজ আমার মুখ পুড়িয়ে দিয়ে গেছে! হে দেবতা,

আমাকে-দয়া কর। তোমার পবিত্র করুণায় আমার পাপের কালিমা লুপ্ত হয়ে যাক্। আমি মার্জ্জনা প্রার্থনা করছি, আমার এই দেহকে, এই রক্ত-মাংসকে, এই পঙ্কিল কামনাকে আমি আর কখনো বড় করে' দেখ্‌ব না!

·········ধীরে ধীরে ধীরে দূর-পশ্চিমে চাঁদ ডুবে যাচ্ছে। আকাশ-ভরা আলোক-ধারায় ছায়ার রং ক্রমেই গাঢ় হয়ে উঠ্‌ছে—কোকিল-পাপিয়ার কণ্ঠ একেবারে নীরব হয়ে পড়েছে।

আস্তে-আস্তে উঠে বস্‌লুম। আমারি মুখের প্রতিচ্ছায়া পড়ে কি চাঁদের মুখ আজ অমন পাণ্ডুর? আমারি বুকের অন্ধকার কি আজ জ্যোৎস্নাকে এমন মলিন করে' তুলেছে?·········

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল! আমার মোহাচ্ছন্ন প্রাণ যখন পুরন্দরবাবুর গভীর ধিক্কারে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল, ও-বাড়ীর ছাদে আমি তখন দুটি মূর্ত্তিকে দেখেছি! আমার স্বামী আর·········কিন্তু তাও কি সম্ভব? আমার সে শোচনীয় লজ্জার ইতিহাস কি তাহলে—

না, এ আমি ভাব্‌তেও পারি না! কপালে যা আছে তাই হবে! স্বামীকে আর আমি একটুও ভয় করি না। তিনিই ত আমাকে দিনে দিনে এমনভাবে দুর্ব্বল করে' তুলেছেন,—মানুষের প্রাণ কত সয়? আমার এই আত্মবিস্মৃতির জন্যে তিনিও কি দায়ী নন? আজ বছরের পর বছর ধরে আমার প্রতি কি তিনি ঠিক কুকুরের মতই ব্যবহার করে আস্‌ছেন না?—

কিন্তু আমার স্বামীর সঙ্গে পুরন্দরবাবুর স্ত্রী কেন? তবে কি— না, মানুষকে আমি আর অত ছোট চোখে দেখ্‌ব না! পুরন্দরবাবুর

মত স্বামী পেয়ে নিশ্চয় কেউ সে সৌভাগ্যকে কলঙ্কিত করবে না,—তা অসম্ভব!

কিন্তু আমার স্বামীকে ত বিশ্বাস নেই! তাঁকে আমি খুব চিনেছি, তিনি না করতে পারেন, এমন কাজ কি পৃথিবীতে আছে? ...... বিশেষ, আজ মাস-কয়েক ধরে তাঁর যে ভাবান্তর দেখছি, সেটা আমার কাছে কেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। আজকাল তিনি যেন সর্ব্বদাই কি ভাবেন, একলা ঘরে বসে নিজের সঙ্গে নিজেই কথা কন, আর বাজার থেকে খরগোশ, ইঁদুর, গিনিপিগ্ কিনে এনে তাদের নানারকম গুঁড়ো ওষুধ খাওয়ান। অবোলা জীবজন্তুগুলো সেই সাংঘাতিক ওষুধ খেয়ে, কেউ তখনি মরে যায়, কেউ-বা ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে মরতে থাকে!

তাদের মৃত্যু-যাতনা দেখেও আমার স্বামীর দয়া হয় না—উল্টে তাঁর মুখে হাসির আভাস ফুটে ওঠে। আমার পোষা কুকুরটা এই-সব দেখে দেখে তাঁকে যমের মত ভয় করে, মরে গেলেও আর তাঁর ছায়া মাড়ায় না, তিনি খাবার দিতে গেলেও সে ল্যাজ গুটিয়ে প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে যায়! বোধ হয় ভাবে, তাঁর-দেওয়া খাবার খেলে তাকে আর বাঁচতে হবে না!

আমি এই-সব ভয়ানক দৃশ্য দেখি, আর চুপ করে' থাকি। যেদিন বড় অসহ্য হয়, সেদিন তাঁকে যদি কিছু বলতে যাই, তিনি গরম হয়ে বলে ওঠেন, "তুমি মেয়েমানুষ, বুঝবে কি? আমি ডাক্তার, এ-রকম পরীক্ষা না-করলে আমাদের চলে না!"

আমি যদি বলি, "তাবলে তুমি কি রোজ এমন করে ঐ জন্তুগুলোকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করবে? এতে কত পাপ হয় তা জানো?"

—"পাপ হয়—কিন্তু ফাঁশী হয় না। তুমি কি বল্‌তে চাও, জন্তুদের ওপরে পরীক্ষা না-করে, এ পরীক্ষাটা করব আমি মানুষের ওপরে? এত সহজে হাতে আমি হাতকড়া পরতে রাজি নই—বুঝেচ? যাও, আমাকে আর বাজে বকিও না!"………

পুরন্দরবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর ঘনিষ্ঠতা আমার ভালো লাগ্‌ছে না। আমি হিংসা করে' এ-কথা বল্‌ছি না—আমার ত হিংসার কোন কারণ নেই! স্বামীর ভালোবাসার আশা যে রাখে না—হিংসায় তার কি অধিকার?

…… …… ……

পরদিন সকালে ভাবনা-বিভোর প্রাণ নিয়ে ঘুম থেকে থেকে জেগে উঠলুম। এখনি স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে। তিনি নিশ্চয়ই কাল্‌কের কথা তুল্‌বেন! তিনি স্বচক্ষে সব দেখেছেন, তাঁকে আমি কি জবাব দেব?

চা তৈরি করছি—এমনসময় স্বামী এলেন। আমার দোষী মন জড়সড় হয়ে পড়ল,—মুখ ফিরিয়ে আমি অন্যদিকে চেয়ে রইলুম।

স্বামী ক্ষাণিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে যেন আমাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। আমার বুকটা কেমন ধড়ফড় করে' উঠল।

একটু পরে বল্‌লেন, "চা হয়েছে?"

—"হুঁ।"

—"দাও।"

চায়ের একটা পেয়ালা আস্তে আস্তে তাঁর দিকে এগিয়ে দিলুম।

তিনি আর কথা কইলেন না। আপন মনে চা খেতে লাগ্‌লেন।

চা-পান শেষ করে' তিনি আবার বল্‌লেন, "পুরন্দরের অসুখ করেচে, তা জান ?"

—"অসুখ ?"

—"হ্যাঁ, জ্বর। আমি এইমাত্র দেখে এলুম।"

—"হঠাৎ তাঁর এমন অসুখ করল কেন ?"

—"বোধ হয় কাল্‌কের রাতের উত্তেজনায় !"

খুব সহজ স্বরেই স্বামী এই কথাগুলি বল্‌লেন। চম্‌কে উঠে চেয়ে দেখলুম, তিনি মৃদু মৃদু হাসছেন! বজ্রাহতের মত আড়ষ্ট হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম।

আমার এই ভাবটা যেন স্বামীর খুব ভালো লাগ্‌ছিল! টেবিলের উপরে দুই হাতে ভর্ দিয়ে, আমার দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন—মুখে তেম্‌নি হাসি!

অসহ্য! অসহ্য! তীব্রস্বরে আমি বলে উঠলুম, "কী দেখচ তুমি ? যা বল্‌বে বল—নৈলে—"

—"নৈলে কি ?"

—"চলে যাও!"

—"হ্যাঁ, তাই যাচ্চি!"—এই বলে হাসি-মুখে উঠে, খুব যেন খুসি-মনে শিষ দিতে দিতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একখানা চেয়ারের উপরে অবশ হয়ে বসে পড়ে আমি হাঁপাতে লাগ্‌লুম।

......কতক্ষণ এম্‌নি বসে ছিলুম বলতে পারি না, হঠাৎ বারান্দায় পদশব্দ পেয়ে আমার সাড় হ'ল। মুখ তুলে দেখি, চাকরটা চলে যাচ্ছে।

তাকে ডেকে বল্লুম, "চায়ের কেট্‌লি আর পেয়ালাগুলো এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যা।"

সে জবাব দিলে, বাবু নাকি তাকে খুব তাড়াতাড়ি অ্যারারুট কিনে আন্‌তে বলেছেন, সুতরাং বাজার থেকে না-এসে সে এখন আর এগুলো সরাতে পার্‌বে না।

ওঁর আবার অ্যারারুটে কি দরকার? কিছু বুঝতে না পেরে আমি আমার গৃহকার্য্যে চলে গেলুম।

কিন্তু সেদিন কি আর কাজে মন বসে? কাল্‌কের রাতে, আজকের সকালে, পরে পরে যে-সব ঘটনা ঘটেছে, মনের ভিতরে সেইগুলো ক্রমাগত জেগে উঠতে লাগ্‌ল। আমার একমাত্র বন্ধু ছিলেন পুরন্দরবাবু, তিনি ত ঘৃণাভরে এ পাপিনীকে ত্যাগ করে গেছেন; আর কি তিনি আস্‌বেন? আমাকে ক্ষমা-প্রার্থনার অবকাশ দেবেন? না, সে আশা আর নেই! ......তার পর, আজ সকালে স্বামীর যে মূর্ত্তি দেখেছি, তাঁর সে মূর্ত্তি যদি বরাবর বজায় থাকে, তাহলে আমার পক্ষে বেঁচে-থাকা নরক-যন্ত্রণার চেয়েও ভয়ানক হয়ে উঠবে। আমি কি করব? কোথায় যাব? কে আমাকে তা বলে দেবে? আমি আর স্বামীর প্রেম চাই না, সংসারে সুখ চাই না, জীবনের আনন্দ চাই না—আমার এখন একমাত্র কাম্য,—শান্তি—শান্তি! যাদের আশা আছে, সৌভাগ্য আছে, পৃথিবীকে তারা যথেচ্ছভাবে ভোগদখল করুক, তাদের অধিকারে আমি ভাগ বসাতে চাই না। আজ আমার মনে হচ্ছে, নির্জ্জন বনবাসের মত সুখের জীবন দুনিয়ার আর-কোথাও নেই!

কাজকর্ম্ম ফেলে আবার নিজের ঘরের দিকে এলুম।

স্বামীর ঘরের সুমুখ দিয়ে আস্‌বার সময়ে হঠাৎ তাঁর গলা শুন্‌তে পেলুম—"এইবারেই বোঝা যাবে পুরন্দর! তুমি হারো কি আমি হারি!"

বুঝলুম স্বামী এখন নিজের সঙ্গে নিজেই কথা কইছেন—কিন্তু এ কী কথা? এর অর্থ কি?

জান্‌লা দিয়ে একবার ঘরের ভিতরে চেয়ে দেখলুম।

একটা এনামেলের বাটিতে অ্যারারুটের মত কি রয়েছে, আর সেই বাটির ভিতরে—আমার স্বামী শিশি থেকে কি-একটা জিনিষ নিয়ে—মিশিয়ে দিচ্ছেন!

—তাড়াতাড়ি সরে এলুম। আজকাল স্বামীর অস্বাভাবিক ভাব-ভঙ্গি কার্য্যকলাপ দেখে, একেই ত আমি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছি, তার উপরে এই-সব দেখে-শুনে আমার সন্দেহ আরো বেড়ে গেল।

আচম্বিতে আমার মনে পড়ল, কালকের দুপুরের কথা। আমি যখন কাল দৈবগতিকে এই ঘরে ঢুকে সেই Reports of Trials for Murder By Poisoning নামে বইখানার ভিতরে স্বামীর হাতে-লেখা কাগজখানা পড়ছিলুম, তখন তিনি ঘরে ঢুকে যে কাণ্ডটা করেছিলেন, তা আমার খুব মনে আছে! সব-চেয়ে বেশী করে' মনে পড়ল সেই কাগজের একটা কথা,—

অ্যারারুটে আর্সেনিক মিশালে আস্বাদে আকারে গন্ধে কিছু-মাত্র তারতম্য ঘটে না!

ভগবান্! ভগবান্! ... ... আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন সচকিতে দুলে উঠে, একেবারে বিদীর্ণ হয়ে গেল!

তেরো

বিনোদের কথা

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! এটা ত জানা কথা ! মানুষের মন নিয়ে এতকাল আমি মিছেই নাড়াচাড়া করি-নি ! ওজন করে' করে' সব কাজ আমি করেছি ! তাই আমি একটুও আশ্চর্য্য হই-নি ! কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীতে আশ্চর্য্য হয় সেই মূর্খরা,—সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত ভেবে-চিন্তে, আগে থাকৃতে সব গুছিয়ে-গাছিয়ে যারা কাজ করতে জানে না! উকিলের ছেলে নেপোলিয়ন যদি সম্রাট হয়েছেন বলে' নিজেই বিস্মিত হয়ে যেতেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাঁর মাথা থেকে রাজমুকুট খসে পড়ত !

আমার একান্ত অবহেলায়, কঠোর ব্যবহারে, কর্কশ কথায় প্রভার মন যাতে আমার প্রতি বিরূপ হয়ে, মিষ্টভাষী, মধুরপ্রকৃতি, রূপবান পুরন্দরের দিকে আকৃষ্ট হয়, সে-পক্ষে আমি বিন্দুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করি-নি। পুরন্দরের সঙ্গে প্রভার মেলামেশাতেও আমি কোন বাধা দিই নি। তারা যখন একসঙ্গে বসে কথাবার্ত্তা কইত, আমি তখন সাধ্যমত তাদের কাছে যেতুম না। তাদের মনের স্বাভাবিক গতিকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে, আমি সুধু আড়ালে বসে তাদের উপরে নজর রাখতুম—অথচ তারা একদিনও এ সন্দেহ করতে পারে-নি যে, একজনের খরদৃষ্টির পাহারা তাদের মাথার ওপরে দিনরাত সজাগ হয়ে আছে।......আমি কি বাহাদুর নই ?

নীতিবাগিশ চিরকাল যাদের ভয় করে' আসছেন, বিচারকরা যাদের

ঠেঙিয়ে অন্নবস্ত্রের যোগাড় করেন, সন্ন্যাসীরা যাদের হাত এড়াতে অরণ্যে পালিয়ে যান, সংসারীরা যাদের সঙ্গে দিবারাত্র লড়ে লড়ে শ্রান্ত, আহত, পরাহত হয়ে পড়্ছে—সেই কুবৃত্তিগুলিই মানুষের মনের যথার্থ স্বাভাবিক, সদা প্রস্তুত, বলবতী বৃত্তি। সমাজ-সংসারের কৃত্রিম বিধি-ব্যবস্থায় মানুষ তার মনের সেই অস্বাভাবিকতা দমন কর্তে চেষ্টা পায় বটে, কিন্তু সে চেষ্টা সত্যসত্যই সফল হয় কি? অনেক মানুষ এই কুবৃত্তিগুলিকে হাতে-নাতে কাজে খাটাতে সাহসী হয় না, জগতে তারা তাই সাধু বলে' বিখ্যাত। কিন্তু এই নিছক কাপুরুষতার সঙ্গে আসল সাধুতার তফাৎ যে আকাশ-পাতাল! এই সাধুর দল কি নিজের বুকে হাত দিয়ে নিজের কাছে জোর করে' বল্তে পারে, 'পর-স্ত্রী দেখে মনে-মনেও আমি তাকে কখনো কামনা করি নি?' হ্যাঁ, এমন সাধু হয়ত দু'চারজন আছে—কিন্তু এই বৃহৎ বিশ্বের কোটি কোটি মনুষ্যের মধ্যে তাঁরা কি গণ্য হ'তে পারেন?

মহাভারতকে অনেকে দেখেন ধর্ম্মপুস্তকের মত, কেউ দেখেন ইতিহাসের মত, কেউ দেখেন কাব্যের মত, কেউ দেখেন রূপকথার মত,—আমার কাছে কিন্তু এই মহাভারত মনোবিজ্ঞানের একখানি মহাগ্রন্থ! একালে অনেকেই কথায়, কাব্যে, উপন্যাসে মনোবিজ্ঞানকে ফুটিয়ে তুল্তে যান্, কিন্তু মহাভারতের মহাকবির পায়ের নখের সঙ্গে এঁদের কারুর তুলনা হয় না। মানুষ যে মনে মনে প্রায়-পশু, এই মহা সত্যটা মহাভারতের পাতায় পাতায় বুঝিয়ে দেওয়া আছে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও যে মনে মনে কত-বড় ভয়ানক কথা ভাবতেন, মানুষের স্বাভাবিক পশুত্বকে যে নর-দেবতার মত বরণীয় মুনি-ঋষিরা পর্য্যন্ত আপনাদের বিরাট জটাজুটের ভারে নিষ্পেষিত করে' ফেলতে পারেন-নি, মহাভারতের মহাকবি কবিত্বের

আড়ালে সে সত্য-কথাও গোপন করেন নি! বাস্তবিক, কী সাহস ছিল এই মহাকবির!

হ্যাঁ, ফাঁক্ পেলেই আমাদের বাইরের মনুষ্যত্বকে পায়ে দলে' ভিতরের পশুত্ব জেগে ওঠে। প্রভা যাতে সেই ফাঁকটা পায়, আমি তারি বন্দোবস্ত করেছি। ফলে যা স্বাভাবিক, প্রভা তাই করেছে।

পতন বড় সাংঘাতিক! পাহাড়ের ধারে যে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি তার পাশে কখনো থেক না। কেননা, তোমার সঙ্গী দৈবগতিকে যদি পড়ে যায়, তাহলে পড়্বার সময়ে তোমাকেও সঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে!

—অতএব প্রভার সঙ্গে পুরন্দরেরও পতন দেখে আমি আশ্চর্য্য হই-নি। কিন্তু সত্যি বল্‌তে কি, পুরন্দরের সততার উপর আমার কিছু কিছু বিশ্বাস ছিল। তার ঐ বলিষ্ঠ চরিত্রকে এতদিন আমি মনে মনে ভয় করতুম। ভেবেছিলুম, সহজে তাকে বাগানো যাবে না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নেমে আজ আমি দেখছি, মানুষের ওপরে এতটুকু বিশ্বাস করাও আমার পক্ষে ভ্রম হয়েছিল! এত সহজে পুরন্দর হার মান্‌লে! এককথায় পর-স্ত্রীর আলিঙ্গনে!……ধিক!

……শ্রীকে এতদিনে একেবারে হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছি। রূপ তার অসামান্য হ'লেও শক্তি তার সামান্য, আমার এই নাগপাশের বাঁধন এড়িয়ে আর সে যাবে, কোথায়? ভবিষ্যতে সে আমার—সে আমার!

ওঃ, প্রতিশোধ কি মধুর! এখনি থেকেই আমি যেন তার আস্বাদ পাচ্ছি!……

কিন্তু না, এখন আত্মহারা হবার সময় নয়, মাছ সবে টোপ গিলেছে,

এখনো খেলিয়ে তাকে ডাঙায় তোলা হয়-নি, এখনো সুতো ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে পারে।......

—পালাবে? উঃ, এ-কথাটা মনে করতেও বুক কেঁপে ওঠে! তাহলে আমি কি বাঁচব? এ কী সাধনার ফলে আজ আমি সিদ্ধির পথে এসে দাঁড়িয়েছি, নিজের অপমানের যন্ত্রণায়, পরাজয়ের দুঃখে, নিষ্ফলতার আক্রোশে কত বৎসর আজ দীন-হীনের মত দণ্ডে দণ্ডে মরে' আসছি, তা কি আমি জীবনে কখনো ভুলব? তারপর এই অমানুষিক আয়োজন —লোকে যা ধারণা করতে পারে না, আমি তাই কার্য্যে পরিণত করতে চলেছি! আমার জীবনের সকল সামর্থ্য এতেই ব্যয় হয়ে গেছে যে! এ আয়োজন ব্যর্থ হ'লে, সেই দণ্ডেই আমি পাগল হয়ে যাব! পালাবে? আমার হাত ছাড়িয়ে শিকার পালাবে? না, অসম্ভব, অসম্ভব!

কিন্তু আর একবার ভেবে দেখি, চক্রান্তের খাঁচাটা রীতিমত শক্ত হয়েছে কিনা—তার মধ্যে শিকার পালাবার কোন ছিদ্র আছে কিনা?

শ্রীর কুসংস্কারে সুবিধা পেয়ে পুরন্দরের অ্যারারুটে আমি আর্সেনিক মিশিয়ে দিয়েছি। শ্রী ভাবছে, এটা তার স্বামীকে বশ করবার ওষুধ! তাকে আমি বলেছি, এ ওষুধটা শ্রী যদি নিজের হাতে স্বামীকে খাইয়ে না দেয়, তাহলে এতে কোন ফল হবে না! এতক্ষণে শ্রী নিশ্চয়ই আমার কথামত কাজ করেছে!

আমাকে আরো দু-একবার আর্সেনিক ব্যবহার করতে হবে। একে-বারে বেশী করে' দিলে ব্যাপারটা সন্দেহজনক হয়ে উঠতে পারে। উপস্থিত যে মাত্রায় দেওয়া হচ্ছে, পুরন্দরের দেহে তাতে কোনরকম পরিচিত রোগের সাংঘাতিক লক্ষণ প্রকাশ পাবে। এই মাত্রায় অনেক

সময় কলেরা বা অতিসারের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ারও সম্ভাবনা। তাহলে ত ভারি সুবিধাই হয়! লোকের চোখে খুব সহজেই ধুলো দিতে পার্‌ব।

আমি ছাড়া এ-বাড়ীতে যাতে আর নতুন ডাক্তার না আসে, সে ব্যবস্থাও করা চাই। নিতান্ত যদি আন্‌তে হয়, তাহলে আর উপায় নেই —কিন্তু না আসাই ভালো। অবশ্য ডাক্তার এলেই যে ভিতরের কথাটা ফস্ করে' ধরে ফেল্‌বে, সে ভয়ও কম। তবু, বলা ত যায় না—সাবধানের মার নেই!

তবে একটা কথা আমার মনে রাখা উচিত। কারুর সন্দেহ না জাগিয়ে যত-শীঘ্র কাজ হাঁসিল করা যায় ততই মঙ্গল। দেরী নয়, দেরী নয়।

পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলে, শ্রীকে আমি গ্রহণ কর্‌ব!...কিন্তু শ্রী কি আমাকে আত্মদান কর্‌বে? ঐখানেই আমার একটু খট্‌কা আছে। শ্রীর মত চরিত্রের রমণী ঠিক স্বাভাবিক ভাবে কাজ করে না, অন্ধবিশ্বাস তাদের সর্ব্বস্ব। আমি হলপ করে' বল্‌তে পারি, অন্ধবিশ্বাসই অনেক রমণীর সতীত্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। নিজেদের কোন চরিত্রবল থাক্ আর না থাক্, অন্ধবিশ্বাসের জোরেই তারা ঠিক বাঁধা পথ ধরে চল্‌বে —সে সময়ে যমকেও তারা ভয় করবে না। শ্রীর এই অন্ধবিশ্বাস আগে আমাকে দূর কর্‌তে হবে। এটা অবশ্য একদিনের কাজ নয়; কিন্তু পরিণামে তাকে আমি বশ কর্‌বই!

আর, কিছুতেই সে যদি আমার বশ না হয়, তাহলে শেষটা আমাকে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ কর্‌তে হবে। স্বামীর মুখে স্বহস্তে সে বিষের পাত্র তুলে দিয়েছে! এ সত্য আমার মুখে তখন সে জানতে পার্‌বে! তারপর?

ভীরু স্ত্রীলোক সে, পুলিসের হাতে পড়বার ভয়ে—দেশব্যাপী নিন্দার ভয়ে, সে কি তখন হতাশ হয়ে আমার পায়ের তলায় এসে আশ্রয় নেবে না ?

বিষ খাইয়ে পুরন্দরকে মার্‌তে আমার আর একটুও আপত্তি নেই। তোমাদের সমাজের বাঁধা নিয়মেও সে এখন অপরাধী। সে আমার স্ত্রী-হরণ করেছে। সুতরাং তাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিতে চাই! প্রথমবারেও শ্রীকে সে আমায় হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়েছিল। একসভা লোকের সাম্‌নে আমার মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল, সকলে মিলে সভা থেকে আমাকে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছিল, সমাজে আমাকে একঘরে হ'তে হয়েছিল! এ-সব অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া কি আমার কর্ত্তব্য নয়? তখন আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, সে প্রতিজ্ঞা কি আমি পালন কর্‌বো না? না, পুরন্দর বন্ধু-বেশে আমার জন্ম-শত্রু, শত্রু-নিধন করা কোন শাস্ত্রেই অধর্ম্ম বলে না।

বাকি রয়েছে প্রভা। ওকে নিয়ে আমি কি কর্‌ব? ওকে দিয়ে আমার আর কোন কাজ হবে না। ওকে দিয়ে যা করিয়ে নেব ভেবে-ছিলুম, তা সিদ্ধ হয়েছে। অমন একটা অকেজো বোঝাকে আর ঘাড়ে বয়ে লাভ নেই।......ঠিক কথা। ও আপদকে বিদায় করে' দেওয়াই ভালো। সমাজের বাঁধা বুলি স্পষ্টই বল্‌ছে, স্ত্রী ততক্ষণ পর্য্যন্ত পালনীয়, যতক্ষণ সে স্বামীর কাছে অবিশ্বাসিনী নয়। কলঙ্কিনী স্ত্রীকে ত্যাগ-করাই মনুর বিধান। সে বিধান শিরোধার্য্য করাই আমার পক্ষে এখন প্রশস্ত।

* * *

দুপুর বেলায় পুরন্দরের বাড়ীতে গেলুম। এতক্ষণ প্রতিমুহূর্ত্তে আমি আশা কর্‌ছিলুম, পুরন্দরের অসুখ বেড়েছে বলে' এই বুঝি শ্রী

আমাকে ডাকিয়ে পাঠায়! কিন্তু কৈ, কেউ ত এল না! এর কারণ কি?

বাড়ীতে ঢুকেই শ্রীর দেখা পেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, "পুরন্দর কেমন আছে?"

শ্রী বললে, "ঘুমোচ্চেন।"

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "ঘুমোচ্চে?...অ্যারারুটটা খাইয়ে দিয়েচ ত?"

—"হ্যাঁ।"

—"খেয়ে কিছু বলেনি ত?"

—"না।"

—"যন্ত্রণা-টন্ত্রণা কিছু হয়-নি ত?"

—"না। অ্যারারুট খেয়ে এতক্ষণ উনি শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন। এখন গিয়ে দেখলুম, ঘুমিয়ে পড়েচেন।"

আর্সেনিকের একটি অদ্ভুত লক্ষণ আছে। সময়ে সময়ে তাতে জ্ঞান আর যন্ত্রণা দুইই লোপ পেয়ে যায়। তবে কি পুরন্দর অজ্ঞান হয়ে গেছে? তার মূর্চ্ছাকে কি শ্রী নিদ্রা ভেবে নিশ্চিন্ত আছে?

কিন্তু গিয়ে দেখ্‌লুম, তাও নয়। পুরন্দর সত্যসত্যই নিদ্রিত। তার নাড়ী পরীক্ষা করে' দেখ্‌লুম। কোনই তফাৎ বুঝতে পারলুম না।

মনে ভারি একটা খটকা লেগে গেল। এ হ'ল কি? বেরিয়ে এসে শ্রীকে আবার জিজ্ঞাসা করলুম, "পুরন্দর অ্যারারুটটা ফেলে দেয় নি ত?"

—"না ঠাকুরপো, না। খালি খালি এককথাই জিজ্ঞাসা করচ

কেন বল দেখি? ওঁকে আমি নিজে হাতে করে' অ্যারারুট খাইয়েচি।"
শ্রীকে আর কিছু না বলে চলে এলুম। এমন ত হবার কথা নয়!
অতখানি আর্সেনিক হজম করে' কেউ কি অনায়াসে ঘুমিয়ে থাক্‌তে
পারে? অসম্ভব! শ্রী নিশ্চয় কিছু ভুল করেছে। আচ্ছা, কাল
যাতে পুরন্দর আমার সাম্‌নে অ্যারারুট খায়, তারি ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।
এ-সব কাজ পরের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে নেই।

হঠাৎ দেখ্‌লুম, জানলার কাছ থেকে প্রভা সরে' যাচ্ছে। আজ
সকালে আমি যখন অ্যারারুট তৈরি করছিলুম, তখনো যেন জানলার
কাছ থেকে ছায়ার মত কি একটা সরে যেতে দেখেছিলুম।

প্রভা এ-রকম লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দেখ্‌ছে কেন? সে কি
কিছু সন্দেহ করেছে? না, সন্দেহ আর কি কর্‌বে?

কিন্তু মনের ধুকফুকুনি ঘুচ্‌ল না। আস্তে আস্তে উঠে প্রভার ঘরে গেলুম।

আমাকে দেখে প্রভা পিছন ফিরে বসে রইল।

আমি বল্‌লুম, "প্রভা, আমার ঘরটা বাসর-ঘর নয় যে, যখন-তখন
তুমি সেখানে আড়ি পেতে বসে থাক্‌বে।"

প্রভা জবাব দিলে না।

—"শুন্‌চ? কথা কইচ না কেন?"

প্রভা ফিরে বস্‌ল। আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "তোমার
কথার জবাব দেওয়া দরকার মনে কর্‌চি না।"

—"তুমি স্পষ্ট করে' কথা বলছ দেখে আমি সুখী হলুম। আমিও
এখন তোমাকে গোটাকতক স্পষ্ট কথা বলতে চাই।"—এই বলে' আমি
একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে প্রভার সাম্‌নে বস্‌লুম।

—"দেখ প্রভা, তোমাকে আমি ভালো না বাস্‌লেও স্ত্রীর আর-সমস্ত অধিকার থেকে আমি তোমাকে বঞ্চিত করি-নি!"

প্রভা তীক্ষ্ণ স্বরে বল্‌লে, "হ্যাঁ, তুমি আমার পেটে ভাত দিয়েচ, পরোণে কাপড় দিয়েচ, আর—যাতে আমার পতন হয় তার পথও বেশ খুলে দিয়েচ! এ-কথা আমি মানি।"

প্রভা যে দেখ্‌ছি উল্টে আমাকেই আক্রমণ কর্‌তে চায়! এর জন্যে ঠিক প্রস্তুত ছিলুম না, অধীরভাবে বল্‌লুম, "তোমার পতনের পথ খুলে দিয়েচি কি-রকম?"

—"ভেবে দেখ।"

—"ভেবে দেখব? কি ভেবে দেখ্‌ব? যা বল্‌চ তা তোমার ভ্রম।"

—"দেখ, আমাকে আর জ্বালিও না।—তোমার পায়ে পড়ি। আমি সব বুঝি। ভ্রম তোমার—তুমি ভাব পৃথিবীতে তোমার মত বুদ্ধিমান্ লোক আর নেই। দেখো, এই ভ্রমই তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌বে।"

—"প্রভা, তুমি এমন সুরে কথা কইচ, যা আমি পছন্দ করি না।"

—"যা পছন্দ কর না, তা সাধ করে' শুন্‌তে চাইচ কেন? আমি ত বল্‌চি, আমাকে রেহাই দাও। তোমার সংসারে থেকে আমারও প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেচে, এখান থেকে এখন একেবারে মুক্তি পেলেই আমি বর্ত্তে যাই।"

—"হ্যাঁ, আমিও তোমাকে একেবারে মুক্তি দিতে চাই। তোমাকে আমি আর বইতে পারচি না। বুঝলে?"

—"এ কথা আজ কেন, অনেকদিন আগেই বুঝেচি। কিন্তু এতদিন

আমি চলে যেতে চাই-নি ·বলেই তুমি বুঝি দায়ে পড়ে আমার ভার সহ্য করে' ছিলে ?"

—"ঠিক। কিন্তু এখন দেখ্‌চি আর সহ্য করা চলে না। তুমি মাত্রার বাইরে গিয়েচ। কাল রাত্রে স্বচক্ষে যে দৃশ্য দেখেছি—"

—"সে দৃশ্যের কথা তোমাকে আর খুলে বল্‌তে হবে না। এখন আমাকে একটু বিশ্রাম কর্‌তে দাও। আজকেই আমি তোমার বাড়ী থেকে বিদায় হয়ে যাব—"

—"কিন্তু তোমার ওপরে আমি অবিচার কর্‌তে চাই না। আমি যখন তোমার স্বামী, তখন আইনত তোমার ভরণ-পোষণের জন্যে আমি দায়ী। তুমি যেখানে যে-ভাবেই থাক, মাসে মাসে আমি তোমাকে অর্থ-সাহায্য কর্‌ব।"

—"কিন্তু তোমার দয়ার দানে আমার একটুও লোভ নেই। নিজের অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা আমি নিজেই কর্‌ব-এখন। দেশে আমার ভাই আছেন, সেখানে আমি ফ্যাল্‌নাও নই।"

প্রভা এমন সহজ ভাবে এই নির্ব্বাসন-দণ্ড নিলে দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। মনে হ'ল, সে যেন আগে থাক্‌তেই আমাকে ত্যাগ করে' যাবে বলে' প্রস্তুত হয়ে ছিল। তার গর্ব্বিত প্রকৃতিকে একটুও খর্ব্ব কর্‌তে পারলুম না বলে' আমার মনে দুঃখ হ'ল। কিন্তু একদিক দিয়ে তাকে আঘাত দিতেই হবে। ভেবে-চিন্তে শেষটা বল্‌লুম, "হ্যাঁ, সুধু তোমার ভাই কেন, আরো অনেকের কাছেই তুমি ফ্যাল্‌না নও। সে কথা আমি জানি।"

—"তোমার কথার মানে ?"

—"অতি স্পষ্ট। আমি বা তোমার ভাই তোমাকে ত্যাগ করলেও, পুরন্দর তোমাকে ত্যাগ করবে না। যতদিন তোমার রূপ-যৌবন আছে, পুরন্দর তোমাকে ফুলদানির তোড়ার মত সাজিয়ে রাখ্‌বে। তোমার আর ভাবনা কি ?"

কিন্তু প্রভা আমার এ খোলাখুলি আক্রমণে একটুও বিচলিত হ'ল না। আমার কথা সে যেন আমোলেই আন্‌লে না! আমার চোখের উপরে তার শান্ত চোখ রেখে, স্থির স্বরে সে বল্‌লে, "পুরন্দরবাবুকে চিন্‌তে হ'লে, তোমাকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে তপস্যা করতে হবে। মাটির ভিতরে যে-সব অন্ধকারের পোকা থাকে, নীলাকাশের উদারতা বোঝা তাদের কাজ নয়।"

প্রভাকে আহত করতে পারলুম না। বরং তার সাহস দেখে আমারি মন ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কোনরকমে আত্ম-সংবরণ করে' বললুম, "তোমার উপমার অর্থ বোঝা একটু শক্ত। কবিতা পড়া বা শোনা কোনকালেই আমার অভ্যাস নেই তা জান ত ?"

—"আগেই ত বলেচি, বুঝতে তুমি পারবে না! তোমার অত্যাচারে অন্ধ হয়ে পুরন্দরবাবুর পায়ের তলায় আমি আশ্রয় নিতে গিয়েছিলুম, কিন্তু তিনি আমাকে মা বলে' ডেকে আমার মুখ রক্ষা করেছেন, আমার মোহ ভেঙে দিয়েছেন, আমার নারীত্বের মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সেই মুহূর্ত্তের ভুলের জন্যে যে পাপ, সে পাপ আমার হয়েচে বটে—কিন্তু আমার দেহ এখনো নিষ্কলঙ্ক।"

—"কিন্তু আমি যে স্বচক্ষে দেখেচি—"

প্রভার সমস্ত মুখ রাঙা হয়ে উঠল! কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে দাঁড়িয়ে উঠে, দুই চোখ মুদে সে প্রবল বেদনায় অস্ফুট স্বরে বল্‌লে, "তুমি যা দেখেচ,

তার জন্যে আমিই দায়ী—আমিই দায়ী! কি নিষ্ঠুর তুমি গো,—নারীর এই গভীর কলঙ্কের কথা তার নিজের মুখে না-শুনে তুমি ছাড়্‌লে না—" বলতে বলতে দ্রুতপদে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

·········কিন্তু এ কী শুনলুম! এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষাতেও পুরন্দরের মন তাহলে বিকৃত হয়ে যায়-নি! পশুত্বই তাহলে সব মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়?······

না, না, না! আমি বিশ্বাস করি না,—প্রভার মিথ্যা কথা!

চোদ্দ

শ্রীর কথা

জানিনে বাপু, মনটা কেন এমনধারা ধুকুফুক্ করছে! ওঁর সঙ্গে ভালো করে' কথা কইতে কেমন-যেন বাধো-বাধো ঠেকছে, থেকে-থেকে কথা কইতে কইতে পালিয়ে আস্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে, প্রাণের ভিতরটা মাঝে-মাঝে অকারণে কেঁদে-কেঁদে উঠছে!—কেন এমন হচ্ছে?

সত্যি-সত্যি, এত লুকোচুরি আমার ভালো লাগ্‌ছে না! স্বামীকে চিরদিন আমি দেবতার মত দেখি, আমার মনের একটা কথাও তাঁর অজানা নেই, আর আজ আমি তাঁকেই বশ করবার জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে বাইরের লোকের কাছে হাত পেতে ওষুধ মেগে নিয়েছি! নিশ্চয় এতে আমার পাপ হয়েছে, আর সেইজন্যেই মনটা খারাপ হয়ে আছে!

বাস্তবিক, ঠাকুরপো আমার কোথাকার কে? দুদিন আগে তাঁকে জানতুম না চিনতুম না, আমার বিয়ের দিন শত্রুর মত তিনি আমাদের

গলায় ছুরি বসাতে চেয়েছিলেন,—তাঁর সঙ্গে পরিচয় ত এইটুকু! আর আজ তিনি আমার এমন কী আপনার লোক হয়ে পড়লেন যে, স্বামীকে লুকিয়ে তাঁর কাছে সব প্রাণের কথা খুলে বল্‌ছি?

আমারি-বা হ'ল কি? স্বামী ছাড়া আর কোন পুরুষের সঙ্গে মরে গেলেও কথা কইতে পারতুম না, উনি এজন্যে কত কথা বলেছেন, কত রাগ করেছেন, তবু আমি কোনদিন ওঁর কথা ভুলেও কাণে তুলি নি! অথচ আজ আমিই কিনা লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে এই নতুন লোকটির সঙ্গে মেলামেশা করছি, এর কথায় কলের পুতুলের মত উঠ্‌ছি-বস্‌ছি! এটা কি ঠিক হচ্ছে?

ঠাকুরপো নিশ্চয় গুণ-টুন কিছু জানে! আমি ত কোন্ ছার, বনের পশুকেও বোধহয় ও বশ কর্‌তে পারে! নৈলে এমন করে' আমাকে ভুলিয়ে দেয়!

কিন্তু এক-একদিন কেন জানিনা, ঠাকুরপোকে আমার যেন কেমন-কেমন মনে হয়! সময়ে সময়ে—আমি যখন পিছন ফিরে থাকি—ঠাকুরপো কি-একরকম চোখ করে' আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, হঠাৎ সাম্‌নে ফিরে আমি সেটা দেখ্‌তে পাই, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরপোর চোখের ভাবও অম্‌নি আবার সহজ হয়ে আসে! সে সময়ে আমার বুকটা যেন শিউরে ওঠে, পুরুষের চোখে ও-রকম ভাব দেখলে আমার বড় ভয় হয়!······কেন, ঠাকুরপোর চোখ অমন হয় কেন? সাম্‌না-সাম্‌নি এক রকম, পিছনে আর-একরকম, এর কারণ কি?

কারণ যাই হোক্, ঠাকুরপোর সঙ্গে আর এত-বেশী মেলা-মেশায় দরকার নেই বাপ্‌, মেয়ে-মানুষের সুনাম কয়লায় লেখার মত,—জলের এক

ঝাপটায় তা মুছে যায়, কিসে কি হয় বলা ত যায় না !......এখনি ত আমি শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেছি—স্বামীকে সন্দেহ করে' লুকিয়ে ঠাকুরপোর কাছ থেকে ওষুধ নিয়েছি,—এ-কথা জানাজানি হয়ে গেলে ওঁর সাম্‌নে আমি মুখ দেখাব কেমন করে' ?—বাঁধন যাতে আরো-বেশী শক্ত না হয়ে ওঠে, এখন থেকে সেই চেষ্টাই কর্‌তে হবে।

আচ্ছা, এ-সব ওষুধ-বিষুধ কি সত্যি, না কেবল কথার কথা ? ঠাকুরপো যদি এতই জানে, পরের স্বামীকে অনায়াসে বশ করিয়ে দিতে পারে, তাহলে সে নিজের বউকে বাগ মানাতে পারছে না কেন ? তার বউটির মন ফেরালেই ত আমি-বেচারী রেহাই পাই, আমার স্বামীরও মন ভালো হয়, ওষুধের জন্যে আমাকেও আর ভেবে মর্‌তে হয় না ! হ্যাঁ, আজ ঠাকুরপো এলে বল্‌ব, আগে তোমার নিজের ঘর সাম্‌লাও, তাহলেই আমার স্বামীর মন ফিরবে !... ... ...

ওকি, ওকে ! ও আমাদের বাড়ীতে কেন ? অ্যাঁ, ওর ত বুকের পাটা কম নয়, বাড়ী বয়ে ও এসেছে কিনা—

আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলুম ! সে আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমার মুখের পানে অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে, একটুখানি হেসে বল্‌লে, "আপনি ত পুরন্দর বাবুর স্ত্রী ?"

অমি আড়ষ্টভাবে ঘাড় নেড়ে জানালুম, 'হ্যাঁ।'

—"আপনার সঙ্গে আমার কখনো আলাপ কর্‌বার সুবিধে হয় নি, আপনি আমাকে চেনেন ত ?"

আবার ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম। মনে মনে বল্‌লুম, 'তোমাকে আবার চিনি না—খুব চিনি ! এত-বেশী চিনি যে জীবনে কখনো ভুল্‌ব না।'

সে আবার হেসে বল্‌লে, "আপনার মুখ দেখে মনে হচ্চে, আমাকে দেখে আপনি ভারি ভয় পেয়েচেন। কেন বলুন দেখি? আমি কি মানুষ নই? বিশ্বাস যদি না হয়, আমার গায়ে বরং হাত দিয়ে দেখুন, আমার দেহের কোনখানটা মোটেই রাক্ষসীর মত নয়—আমি ঠিক আপনার মতই জলজ্যান্ত মানুষ!"—এই বলে সে আমার হাত ধর্‌লে!

আমি কি কর্‌ব—কি বল্‌ব ভেবে না পেয়ে যেমন ছিলুম, তেম্‌নি চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলুম।

তারপর সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে, ধীরে ধীরে বল্‌লে, "বোন, আমাকে দেখে তুমি যে কেন এমন জড়সড় হচ্চ তা আমি বুঝেচি। কিন্তু ভাই, এতবড় দুনিয়ায় এত-রকমের লোক অবস্থার ফেরে পড়ে' সবাই কিছু নির্ভুল কাজ করতে পারে না। ভুল-ভ্রান্তি অনেক হয়! পড়তে পড়তে মানুষ যেমন চল্‌তে শেখে, আমরাও অনেকে তেম্‌নি আগে ভ্রম না করে' ভ্রম সংশোধন করতে পারি না! এটা আমাদের দুর্ব্বলতা, কিন্তু যারা দুর্ব্বল, তারা কি তোমাদের কাছ থেকে একফোঁটাও দয়ার আশা কর্‌বে না?"

এমন দুঃখিত ভাবে সে এই কথাগুলি বল্‌লে, আমিও দুঃখিত না হয়ে থাক্‌তে পারলুম না। সে যে কত-বড় অন্যায় কাজ করেছে, এটা সে বুঝতে পেরেছে দেখে তার উপর থেকে আমার রাগ অনেকটা কমে এল।

সে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "পুরন্দর বাবুর অসুখ হয়েছে, না?"

—"হ্যাঁ।"

—"এখন কেমন আছেন?"

—"জ্বরটা নেমে এসেচে।"

—"তিনি কোথায় ?"

—"ঐ ঘরে।"

—"আমি তাঁর সঙ্গে একটিবার দেখা কর্‌ব। তোমার কি আপত্তি আছে ভাই ?"

এই দেখা-করার কথাটা আমার কিন্তু ভালো লাগল না। এত কথার পর আবার দেখা-করার কথা কেন ? একবার যখন ভুল হয়েছে, আবার ভুল হ'তে কতক্ষণ !

সে একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি ভাবছি দেখে সে একটু ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে, "ভেবনা ভাই, ভেব না ! আমি বাড়ী বয়ে তোমার স্বামী চুরি করতে আসি-নি ! নেহাৎ যদি বিশ্বাস না কর, এইখানেই না-হয় তুমি ঘাটি আগলে পাহারা দাও, সন্দেহ হলেই আমাকে গ্রেপ্তার করতে পার্‌বে।"

আমি লজ্জা পেয়ে বল্‌লুম, "ঐ পথ দিয়ে গেলেই ওঁর ঘরে যেতে পারবেন।"

কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা কাগজ বের করে' সে বল্‌লে, "দেখ বোন, ততক্ষণে তুমি এই চিঠিখানা বসে বসে পড়ে ফেল। সব কথা মুখে বল্‌বার সুবিধে হবে না ভেবে এই চিঠিখানা আমি লিখে রেখেচি। জেন, এর প্রত্যেক কথাটি সত্য। অবিশ্বাস কর্‌লে তোমারি অমঙ্গল হবে। তোমার মুখ চেয়ে, এই চিঠির কোন কথা আমি তোমার স্বামীকে জানাব না—সে জন্যেও কিছু ভেবো না। এই নাও।"

আমি হাত পেতে চিঠিখানা নিলুম, সে আমার স্বামীর ঘরের দিকে চলে গেল।

হঠাৎ এ কিসের চিঠি? আর আমাকেই বা লেখবার উদ্দেশ্য কি? ভারি আশ্চর্য্য হয়ে পত্রখানা খুলে পড়লুম :—

"প্রিয় ভগ্নি!

আমার সঙ্গে তোমার কোন পরিচয় নেই, অথচ গায়ে পড়ে আমি তোমাকে চিঠি লিখছি দেখে তুমি বোধহয় বিস্মিত হবে। কিন্তু তোমার মাথার উপর যে বিষম বিপদ ঝুলছে, সেটা তোমাকে জানিয়ে দিবার জন্যেই এই পত্র লেখার দরকার হয়েছে।

ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝতে পারি-নি; তবে কতক কতক আন্দাজ করে' যেটুকু মনে হয়েছে, কোনরকম আড়ম্বর না করে সেটুকু তোমাকে আমি বলছি, শোন। যা বল্‌ব, সংক্ষেপেই বল্‌ব, কারণ গুছিয়ে-গাছিয়ে সমস্ত খুলে বল্‌বার সময় বা মনের অবস্থা এখন আমার নেই।

আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসেন না। কিন্তু তিনি বোধ হয় তোমাকে·········। তবে, তাঁর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে তোমার স্বামী বাধার মত দাঁড়িয়ে আছেন বলে', খুব-সম্ভব তিনি সেই বাধা দুর কর্‌তে চান। আমার এতটা আন্দাজ কর্‌বার কারণ, আজ সকালে তিনি তোমাদের বাড়ীতে পাঠাবার জন্যে যে অ্যারারুট তৈরি করেছিলেন, তাতে বিষ মেশানো ছিল! সেই অ্যারারুট আমি একটা ইঁদুরকে খাইয়ে দেখেছি,—ইঁদুরটা মরে গেছে!

অ্যারারুট তৈরী করে'ই আমার স্বামী নিশ্চয়ই তোমাদের বাড়ীতে তখনি পাঠিয়ে দিতেন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে হঠাৎ কোন রোগীর বাড়ী থেকে কে তাঁকে ডাক্‌তে এল, তিনি তার সঙ্গে কথা কইবার জন্যে নীচে নেমে গেলেন। সেই ফাঁকে ঘরে ঢুকে বিষাক্ত অ্যারারুটটা আমি সরিয়ে

ফেল্‌লুম। ষ্টোভের উপরে তখনো খানিকটা ভালো অ্যারারুট ছিল। খালি বাটিটা ধুয়ে বাকি অ্যারারুটটা আমি তার ভিতরে ঢেকে রেখে চলে আসি। আমার স্বামী কিছুমাত্র সন্দেহ না করে' সেই অ্যারারুটটাই তোমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যাঁর জন্যে বিষ তৈরি করা হয়েছিল, দৈবগতিকে তিনি এ-যাত্রা বেঁচে গেছেন।

কিন্তু ভবিষ্যতের জন্যে তোমরা সাবধান হ'ও। কারণ এবারে দৈব তোমাদের বিরুদ্ধে হ'তে পারে। আমি আর এখানে থাক্‌ব না—আজই আমার বিদায় হওয়ার কথা।

আর এক কথা। কথাটা আমার লজ্জার কথা, ভ্রমের কথা। কিন্তু আমার সামান্য লজ্জা বা ক্ষণিক ভ্রমের জন্যে যে তুমি তোমার স্বামীর প্রতি চিরকাল একটা অন্যায় সন্দেহ ও অবিশ্বাস পোষণ করবে, স্বামীভক্তি হারিয়ে আপনার সারাজীবন ভারবহ করে' তুল্‌বে, এ ত কখনি হ'তে পারে না! নিজের মুখ পুড়িয়েছি, এখন তোমাদের সুখেও বাধা দিলে আমার যে নরকেও ঠাঁই হবে না!

বোন, কাল রাতে আমার স্বামীর সঙ্গে তোমাকেও আমি তোমাদের ছাদের উপরে দেখতে পেয়েছিলুম। ঠিক জানিনা, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমার স্বামীই তোমাকে ছাদের উপরে নিয়ে গিয়েছিলেন! আমাদের বাড়ীর ছাদের উপরকার দৃশ্য দেখে, তুমি যাতে তোমার স্বামীর উপরে ভক্তি-ভালোবাসা হারাও, এইটেই বোধহয় আমার স্বামীর মনের ইচ্ছা ছিল।

কিন্তু তুমি যা দেখেছ, যা ভেবেছ, যা বিশ্বাস করেছ—সব ভুল, সব ভুল! সুধু চোখে দেখে, কাণে কিছু না শুনে সব সময়ে সব কথা বিশ্বাস

কোরো না! ভীরু মানুষ স্বচক্ষে ছায়া দেখেও ভূত মনে করে, তোমার সন্দিগ্ধ চোখও তেম্‌নি তোমার স্বামীর বাইরের ভাবভঙ্গি স্বচক্ষে দেখেও যথার্থ সত্যের প্রতি অন্ধ হয়ে আছে।

স্পষ্ট করে' আমি আর কিছু বল্‌তে পার্‌ছি না—আমার লজ্জা করছে। পাপ কর্‌তে আমার লজ্জা হ'ল না—সে পাপ স্বীকার কর্‌তে আমার এত লজ্জা কেন? এই কি পাপীর লক্ষণ?

তবু বল্‌তে হবে!··· ··· ··· তোমার স্বামী নিষ্পাপ দেবতা, তিনি আমাকে কথনো কুদৃষ্টিতে দেখেন-নি—কালও না! আমিই আগে তাঁকে······

কিন্তু তিনি আমার ভ্রম ভেঙে দিয়েছেন। তিনি আমাকে পাপী বলে' ত্যাগ করেন-নি, তিনি আমাকে গ্রহণ করেছেন—কিন্তু মা বলে ডেকে!

সেই এক মাতৃসম্বোধনে আমার পাপী প্রাণ আজ অনুতাপে হাহাকার করে' কাঁদছে। উপন্যাসে-নাটকে চরিত্র-পরিবর্ত্তন অনেক পড়েছি, কিন্তু বাস্তব জীবনেও এক মুহূর্ত্তে এমন পরিবর্ত্তন যে সত্যই সম্ভব, আগে তা জানতুম না। ভগ্নী, তোমার স্বামী কাল আমার নারীত্বকে কলঙ্ক-সাগর থেকে উদ্ধার করেছেন।

বিশ্বাস কর না-কর—এই আমার শেষকথা। আর আমার কিছু বল-বার নেই। আজীবন স্বামীর পায়ে তোমার সেবার পূজার অধিকার থাক্‌—সর্ব্বশেষে এই কামনা করে' তোমাদের কাছ থেকে আমি চিরবিদায় গ্রহণ কর্‌ছি। তোমাদের পথে আর-কথনো আমি পায়ের দাগ ফেল্‌ব না। ইতি

অভাগী প্রভা

পুঃ। হ্যাঁ, এখনো একটু বাকি আছে—মনের ঝোঁকে এ কথাটা বল্‌তে আমি ভুলে গিয়েছিলুম। আমার স্বামীকে স্পষ্ট জানিও যে, তুমি সব জেনেছ, কিন্তু তোমার স্বামীকে কিছুই জানিও না। এ নিয়ে আর গোলমাল করে' ফল নেই—অতীতের গেল-দিন ক'টা দুঃস্বপ্নের মত ভুলে যেও।"

... ...

চিঠিখানা আমি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আগাগোড়া পড়লুম! একবার পড়া সাঙ্গ হয়ে গেল, আবার পড়লুম—আবার পড়লুম—আবার পড়্‌লুম! ... ... এখনো মনে হচ্ছে, আমি জেগে নেই!

জোর করে' আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম—কিন্তু তখনি আবার ঘুরে মেঝের উপরে পড়ে গেলুম! একি সত্যি? একি সত্যি? হে মা দুর্গা, এতদিন কি মিছেই আমি তোমাদের পূজা করেছি?

বুকের মাঝে যেন দাউ দাউ করে' আগুন জ্বলে উঠ্‌ল—মনে হ'তে লাগল, আমি যেন নরকের ভিতরে পড়ে আছি—চোখের সাম্‌নে খালি অন্ধকার, সেই অন্ধকার থেকে কারা যেন তীরের মত ছুটে আস্‌ছে—তাদের রং যেন অন্ধকারের চেয়ে আরো কালো, তাদের চোখ যেন উল্কা-পিণ্ডের মত জ্বলন্ত, তাদের লম্বা লম্বা হাত যেন চারিদিক থেকে আমাকেই খুঁজছে! ওগো মা, ওগো মা, আমার একি হ'ল! কে আমাকে বাঁচাবে—কে আমাকে নরক থেকে উদ্ধার করবে—মাগো, ওমা!

হঠাৎ কে আমার গায়ে হাত দিলে! ভয়ে আমার আগাপাশতলা ছম্‌ছমিয়ে উঠল, চম্‌কে দু-হাতে ভর্ দিয়ে ফিরে দেখি,—আবার তিনি!

তাঁর কোলের ভিতরে মুখ গুঁজে পড়ে ডু্‌করে কেঁদে বলে' উঠলুম,

"হ্যাগা, বল—সত্যি করে' বল, স্বামীকে আমি কি নিজের হাতেই বিষ খাইয়েছি ?"

কোমল সুরে তিনি বল্লেন, "না ভাই, ভগবান তোমাকে সে মহাপাপ থেকে রক্ষা করেচেন—তোমাকে ত আগেই আমি বলেচি, অ্যারারুটে বিষ ছিল না !"

—"কিন্তু তোমার স্বামী ত বিষ মনে করেই সে বাটিটা আমাকে দিয়েছিলেন। আর আমিও সেই—"

—"অতটা ভেবে নিয়ে মিছে মন খারাপ কোরো না। তার চেয়ে এখন নিজেকে সাম্লাবার চেষ্টা কর, তুমি এখন শক্ত না হ'লে সবদিক নষ্ট হয়ে যাবে। ওঠ বোন, ওঠ, এমন করে' পড়ে থাক্‌তে নেই—ছিঃ !" এই বলে' তিনি আমাকে ধরে আস্তে আস্তে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

কিন্তু আমার শক্তি কে যেন একেবারে হরে' নিয়েছিল, দাঁড়াতে আমি পারলুম না, একখানা চৌকির উপরে অবশ হয়ে আবার বসে পড়লুম।

খানিকক্ষণ নীরবে আমার দিকে চেয়ে থেকে, ধীরে ধীরে তিনি দরজার দিকে অগ্রসর হলেন—কিন্তু হঠাৎ তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে অস্ফুট স্বরে বলে' উঠ্‌লেন, "ঐ আমার স্বামী আসচেন ! ··· ··· সাবধান !"

আতঙ্কে আমার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠল ! ও রাক্ষস—যদি আবার আমাকে একলা পায়, তাহ'লে আমি আর বাঁচব না। ছুটে গিয়ে প্রভার দু-হাত চেপে ধরে কাতরভাবে আমি বল্লুম, "ও দিদি, তুমি যেও না—ও দিদি তুমি যেও না !"

তিনি আমার দিকে তাঁর ম্লান মুখখানি ফিরিয়ে বল্লেন, "কিন্তু আমি আর থেকে কি করব ভাই ?"

—"তোমার স্বামীকে চলে যেতে বল, আমি আর ওর সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাই না!" বল্‌তে বল্‌তে বিনোদ এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই সাম্‌নে প্রভাকে দেখে সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লে, "একি? তুমি! এখানে তুমি?"

স্বামীকে দেখেই প্রভার ধরণ-ধারণ সব বদ্‌লে গেল! আমাকে আড়াল করে' দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে সে বল্‌লে, "হ্যাঁ আমি। আমায় দেখে এত আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন?"

—"তুমি যে এখানে আস্‌বে তা আমি মনেও করি-নি। বৌদিদির সঙ্গে তোমার আবার কবে আলাপ হ'ল?"

—"আজ।"

—"আজ! হঠাৎ এতদিন পরে তোমার এ সাধ হ'ল কেন?"

—"কেন তা শুন্‌লে তুমি চম্‌কে যাবে!"

—"বটে! কিন্তু এত অল্পে ত চম্‌কানো আমার স্বভাব নয়, তা তুমি জানো ত?"

—"তাই নাকি? তোমার হাতের ঐ বাটিতে, ঐ অ্যারারুটে কি মেশানো আছে, সে কথা বল্‌লেও তুমি চম্‌কে যাবে না?"

আমার বুক শিউরে উঠল! কি ভয়ানক, এতক্ষণ আমি দেখ্‌তে পাই নি—বিনোদের হাতে সত্যি-সত্যিই যে একবাটি অ্যারারুট! সেদিকে চেয়েই আমি চেঁচিয়ে কেঁদে ফেল্‌লুম্—ভয়ে আমার প্রাণ যেন উড়ে গেল!

বিনোদ একবার আমার দিকে, আর-একবার তার স্ত্রীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলে। তারপর বল্‌লে, "কি বলচ প্রভা?"

—"বল্‌চি তোমার ঐ অ্যারারুটে বিষ মেশানো আছে!"

বিনোদের হাত থেকে খসে, ঝন্-ঝন্ শব্দে আরারুটের বাটিটা মেঝের উপরে পড়ে গেল! পিছনে হটে গিয়ে, দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে সে স্থির চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল!

উঃ! সে ত চোখ নয়—যেন দু-টুক্‌রো জ্বলন্ত কয়লা! তাড়াতাড়ি আমি প্রভার পিছনে গিয়ে লুকিয়ে দাঁড়ালুম!

খানিক এম্‌নি চুপচাপ থাকার পর বিনোদ বল্‌লে, "প্রভা, তুমি কি পাগল হয়েচ? এ-সব কি কথা?"

—"পাগল আমি হই-নি, পাগল হয়েচ তুমি। নইলে সহজ মানুষ কখনো এমন কাজ কর্‌তে পারে?"

—"কাজ!—কি কাজ? তুমি যা বল্‌চ সব মিছে কথা!"

—"মিছে কথা। বটে! তাহলে মিছে কথা শুনে তোমার হাত থেকে ভয়ে ও-বাটিটা পড়ে গেল কেন?"

বিনোদ হা হা করে' হেসে উঠল! বল্‌লে, "ভয় কর্‌ব কাকে প্রভা? তোমাকে?"

—"আমাকে নয়—ভয় কর তুমি সত্যি কথাকে!"

বিনোদ হঠাৎ গলাটা খুব গম্ভীর করে' বল্‌লে, "প্রভা, তোমার এ-সব হাসি-ঠাট্টা আমার ভালো লাগ্‌চে না,—যাও, বাড়ী যাও!"

—"বাড়ী কোথায় আমার? তুমি ত সেখান থেকে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছ!"

—"আঃ! কী যে বাজে বক্‌চ—তুমি কি ঠাট্টা বোঝ না? বাড়ী থেকে তোমায় আমি তাড়িয়ে দিতে যাব কেন? যা নয় তাই বল্‌লেই হ'ল! যাও, বাড়ী যাও!"

—"না। এ-জীবনে তোমার বাড়ীতে আর আমি ঢুকব না।"

চোখ কুঁচকে ঠোঁট কাম্ড়ে বিনোদ বল্লে, "তবে তুমি চুলোয় যাও! তোমার মত স্ত্রীকে বাড়ীতে যেতে বল্‌চি এই ঢের! তুমি যে বাড়ীতে থাকবার যোগ্য নও, বৌদিও তা জানেন। ছাতের ওপরে তোমাদের অভিনয় বৌদি কাল স্বচক্ষে দেখেচেন। নিজের পাপ ঢাকবার জন্যে তুমি এসেচ উল্‌টে আমাদের চোখ রাঙাতে? তোমার মত পাপিষ্ঠার কথায় বিশ্বাস করে কে? আমি ত করিইনা, বৌদিও কর্‌বেন না! না বৌদি?"

আমি শুক্‌নো গলা টেনে টেনে স্পষ্টাস্পষ্টি বল্‌লুম, "আপনার স্ত্রীর কথায় আমি বিশ্বাস করি।"

বিনোদ থতমত খেয়ে অবাক হয়ে রইল।

প্রভা বল্‌লেন, "এখন শুনলে ত? আর মিছে চেষ্টা, ভগবানের রাজ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারে না। বাড়ীতে পুরন্দর বাবু আছেন, এখনি তিনি সব শুন্‌তে পাবেন,—তখন সব জানাজানি হয়ে যাবে। তার চেয়ে কেউ কিছু জানবার আগে এইবেলা তুমি সাবধান হও, এখান থেকে চলে যাও, আর এখানে এস না।"

প্রভার সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে বিনোদ বল্‌লে, "আবার তুমি আমাকে মিছে ভয় দেখাচ্চ! আমি কি করেচি যে, এখান থেকে চোরের মত চলে যাব?"

—"না, তুমি চোরের মত যাবে না—এখান থেকে তুমি খুনীর মত যেতে চাও, নয়? এখনো তুমি লুকোচুরি কর্‌চ, এখনো আমার কথা মান্‌তে চাইচ না! অথচ আজ সকালে তোমাকে আমি স্বচক্ষে অ্যারারুটে বিষ মেশাতে দেখেচি!"

—"তাই যদি হবে, তবে সে অ্যারারুট খেয়ে পুরন্দরের কোন অনিষ্ট হয়-নি কেন? এইখানেই ত প্রমাণ হচ্চে, তুমি মিথ্যে কথা বল্‌চ!"

—"সে বিষাক্ত অ্যারারুট্ ফেলে দিয়ে বাটিতে আমি ভালো অ্যারারুট ঢেলে দিয়েছিলুম, তাইতেই তোমার—"

প্রভার কথা শেষ না হ'তেই বিনোদ ঠিক বিদ্যুতের মত আচম্‌কা, তাঁর গায়ের উপরে লাফিয়ে পড়্‌ল! ভয়ে আমি খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম—সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে ক্রুদ্ধস্বর শুন্‌লুম, "বিনোদ! বিনোদ! একি ভয়ানক কাণ্ড!"

এ আমার স্বামীর গলা!

পনেরো

পুরন্দরের কথা

ভগবান, আমার এ ওষ্ঠাধর এখনো যেন কি-এক অগ্নিশিখায় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে! মানুষকে তুমি শ্রেষ্ঠজীব করে' সৃষ্টি করেছ—অথচ তার মনের মধ্যে দুরন্ত পশুর মত অশান্ত, এমন-এক জ্বলন্ত লালসাকে পূরে রেখেছ কেন? তোমার এই সুন্দর সৃষ্টিতে, এই উদার আকাশের ছায়ায়, এই স্বাধীন বাতাসের পবিত্র স্পর্শে, এই উদয়-অস্তের চিরন্তন খেলায় চন্দ্র-সূর্য্যের লীলায় আলোক-আঁধারের অবিরত আবর্ত্তনে নির্ম্মল সৌন্দর্য্যের বিচিত্র প্রকাশে মানুষ কেন আপনার দীনতা-হীনতা ভুল্‌তে পারে না—কেন সে শ্রেয় হ'তে গিয়ে হেয় হয়ে পড়ে—কেন সে উচ্চ আদর্শকে ব্যর্থ করে' দেয়? এই যে পদে পদে অন্ধকারের ঝড় উঠে পথের উপর

থেকে ধ্রুবতারার আলো একটি ফুৎকারে নিবিয়ে দিচ্ছে, এর-মধ্যে তোমার কোন্ মঙ্গল-ইচ্ছা গোপন হয়ে আছে? আপনাকে সংবরণ কর্‌তে না-পেরে বিশ্বের শত-সহস্র আত্মা এই-যে দিবারাত্র হাহাকারে ফেটে মর্‌ছে, এ গভীর হাহাকার কি তোমার শান্তিকে বিক্ষুব্ধ করে' তুল্‌ছে না? ...... হে রহস্যময় মহাদেব, তোমার এই বিরাট গুপ্তকথা কি কোনদিনই আমরা বুঝতে পার্‌ব না?

বাস্তবিক, প্রভার সঙ্গে এতদিন মেলামেশা করেছি, তার চরিত্রের কত দিকই আমার চোখে পড়েছে, কিন্তু তবু ত তার মনের তলে গিয়ে কোন দিনই পৌঁছতে পারি-নি! বাইরে তার চোখের কোণে সামান্য-একটু ইঙ্গিতও যদি কোনদিন পেতুম, তাহ'লেও আমি যে আগে-থাক্‌তে সাবধান হ'তে পার্‌তুম! কোনরকম পূর্ব্বাভাস না-দিয়ে মানুষের মন যে এত-সহসা আত্মপ্রকাশ কর্‌তে পারে, এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল!

কিন্তু প্রভার এই আচরণের জন্যে বোধ হয় বিনোদই বেশী দায়ী। প্রভার মুখেই যতদূর শুনলুম তাতে বেশ বুঝলুম, বিনোদ তাকে ভালোবাসে না, তার উপরে অত্যাচার করে, তাইতেই তার মন ক্ষুধিত হয়ে উঠেছে, বিদ্রোহী য়ে উঠেছে! যৌবন আশ্রয় চায়, কোমলতা চায়, প্রেমের পূর্ণতা চায়—প্রভার যৌবন যে এর কিছুই পায়-নি। যৌবন হচ্ছে অধীর ও অদূরদর্শী;—তার ধৈর্য্য নেই, সহ্য কর্‌তে সে জানে না! প্রভার কাল্‌কের ব্যবহারে যৌবনের এই দুর্নিবার ধর্ম্মই বোধহয় প্রকাশ পেয়েছে, সে যা করেছে, বোধহয় তা আকস্মিক ভাবের আবেগে অভিভূত হয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই করে' ফেলেছে। একটা কিছু করে' ফেলে পরে অনুতপ্ত হওয়া—যৌবনের এও একটা মস্ত লক্ষণ! হয়ত প্রভা এতক্ষণে নিজের ভ্রম বুঝে অনুতপ্ত হয়ে পড়েছে। ......

দরজার কাছে একটা শব্দ হ'ল। মুখ তুলে দেখি, প্রভা!

তার মুখ কি ম্লান, চোখ কি করুণ! মাটির দিকে দৃষ্টি নামিয়ে, জড়সড় হয়ে সে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল—যেন একখানি সলজ্জ বিষাদ-প্রতিমা!...... কাল রাত্রে সেই অশুভ মুহূর্ত্তে তার চোখে-মুখে যে উদ্দাম ভাব, যে প্রচণ্ড তৃষা ফুটে উঠেছিল, তার সঙ্গে আজ্‌কের এ মূর্ত্তিতে কী তফাৎ, কী তফাৎ!

আশ্চর্য্য! মানুষের এই নিত্য-দৃষ্ট সাধারণ মুখ ক্ষণিক ভাবের পরিবর্ত্তনে কতটা অসাধারণ হ'য়ে ওঠে!

শুয়ে ছিলুম, তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌লুম। প্রভা আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখেই ঘাড় হেঁট কর্‌লে। আমি হাত বাড়িয়ে তার হাত ধর্‌লুম—তার হাত কাঁপ্‌তে লাগল! ধীরে ধীরে বল্‌লুম, "এস প্রভা, বোসো! কাল্‌কের জন্যে আজ যে তুমি কষ্ট পাচ্চ, তোমার মুখ দেখেই আমি তা বুঝেচি। আজ তোমার হাসিমুখ দেখ্‌লে আমি দুঃখিত হতুম, কিন্তু তোমার মলিন মুখ আজ আমাকে আনন্দিত করেচে। তোমার ভ্রমের কথা ভুলে যাও, এস, আমরা ফের আগেকার মতই প্রাণ খুলে আবার কথাবার্ত্তা কই।"

প্রভা কেঁদে ফেললে!

আমি হাত ধরে' তাকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে বল্‌লুম, "প্রভা, চোখের জল মোছ। এখনি শ্রী এসে পড়্‌তে পারে।"

প্রভা আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে বল্‌লে, "আপনি এখন কেমন আছেন?"

—"বেশ ভালোই আছি প্রভা! কাল রাতে হঠাৎ একটু জ্বর এসেছিল, এখনি কমে গেছে—দুদিনেই সব সেরে যাবে।"

প্রভা অল্পক্ষণ চুপ করে' বসে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বল্‌লে, "পুরন্দরবাবু, আমি যা জান্‌তে এসেছিলুম তা জান্‌লুম। আপনি যে আমাকে ক্ষমা করেচেন, আপনি যে চিরকাল আমাকে ঘৃণা কর্‌বেন না—এটুকু জেনেও আমি এখন অনেকটা শান্তি পেলুম। আমার আর কিছু বলবার নেই।" এই বলে' প্রভা উঠে দাঁড়াল।

—"প্রভা, ঘৃণা আমি কারুকে কর্‌তে পারি না—অতি-বড় শত্রুকেও না। এ পৃথিবী হচ্চে মানুষেরই স্বদেশ, মানুষের প্রতি ঘৃণা থাক্‌লে এখানে বাস কর্‌ব কেমন করে' বল দেখি ?"

—"কিন্তু আমার মত পাপীকে ঘৃণা না কর্‌লে পাপকে যে প্রশ্রয় দেওয়া হবে,—পাপী যে ঘৃণার পাত্র।"

—"না, পাপীও মানুষ, মানুষ কখনো ঘৃণিত নয়—ঘৃণিত তার পাপ। সকল মানুষেরই মনের ভিতরে পাশাপাশি ভগবানের আর সয়তানের বাস আছে। সেই সয়তানকে ত্যাগ কর্‌ব বলে আমরা যদি গোটা মানুষটাকেই ত্যাগ করি, তাহলে সেইসঙ্গে ভগবানকেও যে ত্যাগ করতে হবে! না প্রভা, এ ঠিক নয়,—যে পাপ করে, তাকে একেবারে ছেড়ো না! তাকে গ্রহণ কর্‌বে, পাপের প্রতি তার নিজেরও যাতে ঘৃণা জন্মে, সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করবে। দৈবগতিকে একবার পাপ করে' চিরকাল ঘৃণিত হয়ে থাকে বলে'ই পাপী আর ইচ্ছে থাক্‌লেও ভয়ে সমাজে ফির্‌তে পারে না! এতে পাপীরও ক্ষতি, মানুষেরও ক্ষতি, সমাজেরও ক্ষতি! এটা আমরা বুঝি না বলে'ই সমাজে পাপের সংখ্যা নিত্যই বেড়ে চলেচে!"

—"আপনার এই উদার মন আমাকে পতন থেকে রক্ষা করেচে, এর-জন্যে চিরকালই আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাক্‌ব—আপনার শিক্ষা জীবনে কখনো ভুল্‌ব না। পুরন্দরবাবু, আপনাকে নমস্কার করে' এখন

আমি বিদায় হই—হয়ত এ-জীবনে আপনার সঙ্গে এই আমার শেষ-সাক্ষাৎ।"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম! শেষ-সাক্ষাৎ? এর অর্থ কি? প্রভা যখন দরজার কাছ-বরাবর গেছে, আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "শেষ-সাক্ষাৎ কেন প্রভা? তুমি কি অন্য কোথাও যাবে?"

—"হ্যাঁ! স্বামী আমাকে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিয়েচেন।"—আর একটি কথাও না বলে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল!

বিনোদ, বিনোদ!······না, এ অসহ্য, স্ত্রীর প্রতি এত অবিচার, এত অত্যাচার! কেন সে একটা জীবনকে এমনভাবে নষ্ট করে দিতে চাইছে? এত-বড় নিষ্ঠুরতা ত মানুষের শোভা পায় না! সে ত চোখ মুদে বিবাহ করে নি, নিজে দেখে-শুনে যাকে বিবাহ করেছে, যার ভালো-মন্দের জন্যে সে দায়ী, সে ছাড়া যার ভিন্নগতি নেই, তাকেই কিনা সে এখন তাড়িয়ে দিতে চায়!

দুর্ভাগী প্রভার মুখ চেয়ে মনটা আমার দয়ায় ব্যথায় ভরে' উঠল। বিনোদ তাড়িয়ে দিলে তার কি অবস্থা হবে?··· ···তাইত, কি করে' এ অন্যায়কে দমন করা যায়? বসে বসে অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে শেষটা স্থির করলুম, এখনি আমার বিনোদের কাছে যাওয়া উচিত। কারুর পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা আমার স্বভাব নয় বটে; কিন্তু চোখের উপরে এমন দৃশ্য অটল হয়ে দেখবই বা কেমন করে'? বেচারী প্রভা! তাকে বাঁচাতেই হবে!

শরীরটা দুর্ব্বল ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সেই অবস্থাতেই আমি শয্যাত্যাগ করে' ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম! ··· ···

সিঁড়ির কাছে গিয়ে নীচে নামতে যাব, হঠাৎ পাশের ঘরে বিনোদের

গলা শুন্‌লুম। তার পরেই পেলুম প্রভার গলা! আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে এমন উত্তেজিত স্বরে প্রভা কি বল্‌ছে বিনোদকে? অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে সেইখানে দাঁড়ালুম। ভাবলুম আর যাই হোক্, ওদের দুজনকেই যখন এক-সঙ্গে এখানে পাওয়া গেল তখন একরকম ভালোই হ'ল!···কিন্তু না, একি, এ-সব কী কথা হচ্ছে! বিষ!... ...অ্যারারুটে বিষ মেশানো হয়েছে? এ কথার মানে কি? ও আবার কি? কার হাত থেকে বাটি না কি একটা খসে ঝন্‌ঝন্ করে' মাটির উপরে পড়ে গেল যে!

সেইখানেই দাঁড়িয়ে গেলুম! ··· ... ... ক্রমে ক্রমে একে একে যে-সব কথা আমার কাণে আসতে লাগল, তাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ ধীরে ধীরে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল! এও কি হ'তে পারে? আমি ভুল শুন্‌ছি না ত? জ্বরের ঘোরে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়-নি ত?

আমার অ্যারারুটে বিনোদ বিষ মিশিয়ে দিয়েছে, আর ··· ··· আর সেই বিষের পাত্র শ্রী আমার মুখের সাম্‌নে নিজের হাতে তুলে ধরেছে! বিনোদ আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, আর শ্রী আমার প্রিয়তমা স্ত্রী! ... ...উঃ!

বুকে যেন কে শেল মার্‌লে! দু-হাতে বুক চেপে ভুঁয়ে বসে পড়লুম!

না, না,—আঃ! বাচলুম! এই যে, শ্রীও এখানে রয়েছে! শ্রীর কথা শুনে মনে হচ্ছে, নিষ্পাপ মনে সে আমাকে অ্যারারুট খেতে দিয়েছিল, বিষের কথা জান্‌ত না!—নিশ্চয়, নিশ্চয়, তা নয় ত কি! শ্রীকে আমি কি চিনি না? নির্ম্মল প্রাণ তার যুথিকার মত শুভ্র, শিশুর মত অকপট, বৃষ্টিধারার মত স্বচ্ছ, এর মধ্যে কলঙ্কের আশ্রয় হবে কেমন করে'?

কিন্তু বিনোদ,—তুমি কি? তুমি কি সত্যিই মানুষ? তাহলে মানুষের গুণ তোমাতে কোথায়? তুমি বন্ধুত্ব মান না, দয়া-ধর্ম্ম জান না, আত্ম-পর ভেদ রাখ না, আপন স্ত্রীকে তাড়িয়ে দাও, হাসি-মুখে পরের প্রাণ

নিতে চাও—এ-সব কি মানুষের লক্ষণ? ভগবানের সৃষ্টি কি এম্‌নি ভয়ানক? এত জ্ঞান-বিজ্ঞান, এত-বড় সমাজ, এতদিনের সভ্যতা, এত উচ্চ আদর্শ, এ সমস্তই কি তবে ব্যর্থ?

আচম্বিতে আমার আচ্ছন্নতা ছুটে গেল—ঘরের মধ্যে ও কার আর্ত্ত-নাদ! সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর চীৎকার! কী ভয়ানক দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছে ওখানে!

প্রাণপণে ছুটে তখনই ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম! ... ... দেখলুম বিনোদের কবলে পড়ে প্রভা ছটফট করছে!

তীরের মতন বেগে তাদের উপরে গিয়ে পড়লুম। দুহাতে বিনোদের হাত-দুখানা চেপে ধরলুম—বাল্যকাল থেকে বলবান বলে' আমার খ্যাতি আছে,—আমার হাতের চাপে বিনোদের হাত অবশ হয়ে এল, তার সে সাংঘাতিক বাহুপাশ থেকে মুক্ত হয়ে, ব্যাঘ্রমুখচ্যুত হরিণীর মত প্রভার দেহ এলিয়ে মাটির উপর পড়ে গেল!

বিনোদকে ছেড়ে দিতেই আবার সে প্রভাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হ'ল, আমি আবার তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লুম, "বিনোদ, শান্ত হও—নইলে আমি দারোয়ানদের ডাক্‌তে বাধ্য হব!"

সে পাগলের মত চেঁচিয়ে দৃপ্তস্বরে বললে, "দরোয়ান! কে তোমার দরোয়ানদের ভয় করে! ছেড়ে দাও আমাকে, ওকে আমি খুন করব।"

—"স্ত্রীলোককে তুমি খুন করবে? বল্‌তে লজ্জা হচ্চে না তোমার?"

বিনোদ আমার মুখের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' বল্‌লে, "লজ্জা! কিসের লজ্জা? স্ত্রী হোক্ পুরুষ হোক্,—যে আমার পথে এসে দাঁড়াবে তাকেই আমি খুন করব!"

—"কেন বিনোদ, প্রভা তোমার কাছে কী এমন অপরাধ করেচে?"

—"কী অপরাধ করেছে! ওর অপরাধের সীমা নেই! ও আমার

সর্ব্বনাশ করেচে, আমার এত দিনের সাধনা, যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম ব্যর্থ করে' দিয়েচে, আমার প্রাণের সব আশা ওর জন্যে নির্ম্মূল হয়ে গিয়েচে, আমার প্রতিহিংসার মহাযজ্ঞ ও পণ্ড করে' দিয়েচে! ওকে আমি ছেড়ে দেব? কখনো না, কখনো না।"

—"প্রতিহিংসা! বিনোদ, প্রতিহিংসা কিসের?"

ভীষণ এক মুখভঙ্গি করে' তীব্র স্বরে বিনোদ বলে' উঠল, "বটে! তুমি কি জান না? আমার বুক থেকে শ্রীকে কে ছিনিয়ে নিয়েছিল? এক-সভা লোকের মাঝে কে আমার মাথা হেঁট করে' দিয়েছিল? সমাজে কার জন্যে আমাদের একঘরে হয়ে থাকতে হয়েছিল? আমার সে হতাশা, সে পরাজয়, সে অপমান লাঞ্ছনা মনস্তাপ কি ভোলবার? না আমি তা ভুলি-নি! সেদিনের দৃশ্য এখনো আমার চোখের ওপরে দুঃস্বপ্নের ছবির মত জেগে আছে! আজ কত বৎসর প্রতিদিন আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, সে অপমানের প্রতিশোধ না-নিয়ে আমি মরব না! প্রতিশোধ আমি নিতুমও ঠিক, কিন্তু ঐ সর্ব্বনাশী প্রভার জন্যে ঠিক শেষ-মুহূর্ত্তে আজ আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েচে!"

এতক্ষণে আমি সব বুঝলুম। সেই—সেই দিনের কথা! ······ স্তব্ধ হয়ে আমি তার রুদ্ধ আক্রোশ-ভরা, ক্ষুব্ধ, বিকৃত, পাণ্ডুর মুখের দিকে নিষ্পলক চক্ষে চেয়ে রইলুম! নিশ্চয় সে পাগল! সহজ মানুষের মুখ এমন হয় না!

—"আমার মুখের দিকে কী দেখ্‌চ তাকিয়ে? এতক্ষণে আজ তুমি কোথায় থাকতে জান পুরন্দর? আমার এই পায়ের তলায়, অন্তিম নিশ্বাসের অপেক্ষায়! কাল তোমার শ্রীকে আবার আমার নিজের করে' নিতুম!"

পিছন হ'তে শ্রী আর্ত্তনাদ করে' বলে' উঠল, "চলে যাও, চলে যাও এখান থেকে! ওগো, ওকে তাড়িয়ে দাও, দূর করে তাড়িয়ে দাও!"

আমি ফিরে বল্লুম, "শ্রী, প্রভাকে নিয়ে তুমি বাড়ীর ভেতরে যাও। প্রভার বড় লেগেচে, ওর মুখে-চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিও।"

প্রভাকে নিয়ে শ্রী তাড়াতাড়ি চলে গেল। আমি বিনোদের হাত ছেড়ে দিলুম।

বিনোদ হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে, "আমাকে নিয়ে এখন তুমি কী করতে চাও? যা কর্‌বার, শীগগির করে ফেল! তোমার চোখের সাম্‌নে এমন অসহায় খেলার পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাক্‌তে আমার প্রাণ যেন বেরিয়ে যাচ্চে!"

—"তোমাকে নিয়ে আমি কিছুই কর্‌তে চাই না।"

—"কী! আমি তোমার শত্রু তা জানো?"

—"না, তুমি আমার বন্ধু। তুমি রাগের মাথায় এ-কথা এখন ভুলে যাচ্চ, কিন্তু আমি ত তা ভুলি-নি! বাল্যকালে একসঙ্গে তোমাতে-আমাতে কত খেলাই খেলেচি, যৌবনেও তোমাকে আমি সত্যিই ভালোবেসেচি, সে-সব স্মৃতি কি হঠাৎ একদিনে ভুলে যাওয়া যায় ভাই? দোষ করেচ বলে' তোমাকে আমি ত্যাগ কর্‌ব না—নিজের ভ্রম তুমি দুদিন পরে নিজেই বুঝতে পারবে!"

বিনোদ আমার সাম্‌নে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ক্রুদ্ধ, তীব্র স্বরে বল্লে, "আমাকে ক্ষমা করে' তুমি কি আমার পরাজয়ের যাতনা আরো বাড়িয়ে তুলতে চাও? না, সে হবে না—হ'তে পারে না! তোমার ক্ষমার ওপরে আমি পদাঘাত করি! আমি তোমার শত্রু, আমি তোমাকে হত্যা কর্‌তে চেয়েছিলুম! আমাকে তুমি পুলিসে দাও, আমাকে তুমি মারো ধর যা-খুসি কর—কিন্তু আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো না! সে অপমান আমি সইতে পার্‌ব না!"

—"তুমি আমার বন্ধু, আমার ব্যবহারকে তুমি ক্ষমা বলে' নিচ্চ কেন? বন্ধুত্বের সম্পর্ক যে আলাদা।"

—"পুরন্দর, আমি তোমার শত্রু! আমাকে মুক্তি দিলেও আমি তোমার শত্রুই থাক্‌ব। ভেবনা তোমার দয়ায় ক্ষমায় ভুলে গিয়ে আমি তোমার গোলাম বনে' যাব! না, তোমাদের ও-সব দুর্ব্বলতাকে আমি ঘৃণা করি—আমার ধাতু আলাদা। আমি আবার তোমাকে খুন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।"

আমি হেসে বল্‌লুম, "সে চেষ্টা ত একবার করে' দেখ্‌লে, কিন্তু সফল হ'লে কি? ভাই, মাথার ওপরে ভগবান যে নিত্যই সজাগ হয়ে আছেন—জন্ম-মৃত্যু যে তাঁর হাতেই!"

—"তুমি পুরুষের ছদ্মবেশে স্ত্রীলোক মাত্র,—নইলে ভগবান মান্‌তে লজ্জা হয় না তোমার! ধিক্, তোমাকে ধিক্! ছি ছি, তোমার মত এক অপদার্থের কাছে আমাকে কিনা হার মান্‌তে হোলো, তোমারি কাছে আমাকে কিনা ক্ষমা গ্রহণ কর্‌তে হোলো! এর-চেয়ে মৃত্যুই আমার ভালো ছিল!" এই বলে আমার দিকে আর-একবার ঘৃণাভরা দীপ্ত চোখে তাকিয়ে, বিনোদ চকিতে দ্রুতপদে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

জান্‌লার কাছে আমি দাঁড়িয়েছিলুম; বাইরে চেয়ে দেখি,—আকাশের তিমিরকৃষ্ণ মেঘের' অরণ্য দুলিয়ে, কাল-বৈশাখীর উন্মত্ত ঝড় পৃথিবীতে হুহু ক'রে' নেমে আসছে!

বজ্রের মুহুর্মুহু অট্টহাস্যে, ভীত জীবজন্তুর ব্যাকুল চীৎকারে, ঝড়ের বিচিত্র আর্ত্তনাদে অকস্মাৎ ধরিত্রীর অন্তরাত্মা যেন ধড়্‌ফড়্ করে' উঠল! চক্ষু অন্ধ করে,' চক্রে চক্রে ঘূর্ণিপাক খেয়ে নিবিড় ধূলার রাশি উঠ্‌ছে-নাম্‌ছে-ছুটছে—নিরেট বৃষ্টিধারার মত চারিধারে সশব্দে ঝরে যাচ্ছে,—মুহূর্ত্ত-

মধ্যে পথিকশূন্য দীর্ঘ রাজপথ বিক্ষুব্ধ ঝটিকার বিজন নৃত্য-সভায় পরিণত হয়ে গেল। ... ...

সেই প্রলয়-অভিনয়কে অগ্রাহ্য করে' বিনোদ পথের উপরে গিয়ে দাঁড়াল, একবার ঊর্দ্ধমুখে জলন্ত চক্ষে ঘন-ঘন বিদ্যুৎবিদীর্ণ উচ্ছৃঙ্খল আকাশের এধার-থেকে ওধার পর্য্যন্ত চেয়ে দেখ্‌লে,—তারপর মাথা নামিয়ে, আর-কোনদিকে না-তাকিয়ে, সুমুখের রাস্তা ধরে হন্‌ হন্‌ করে' সমান চল্‌তে লাগল অটল পদে, অনায়াসে,—ঝঞ্ঝার শরীরী মূর্ত্তির মত!

... ... অনেকদিনের অদর্শনের পরে, ঐ কাল-বৈশাখীর মত আমাদের জীবনের মাঝখানে বিনোদ হঠাৎ এসে উদয় হয়েছিল; আবার ঠিক ঐ কাল-বৈশাখীর মতই হঠাৎ আজ সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল;—জানিনা, তার সঙ্গে আমার এই দেখাই শেষ-দেখা কিনা!

... ...

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছি, এমন সময়ে পিছনে শ্রীর সাড়া পেলুম—

—"হ্যাঁগো, সে চলে গেচে?"

—"হ্যাঁ।"

—"আঃ, বাঁচলুম!"

শ্রী ছুটে এসে প্রাণপণে আমার গলা জড়িয়ে ধর্‌লে। তারপর আমার বুকের ভিতরে মুখ গুঁজে অস্ফুট কণ্ঠে সে কাঁদতে লাগ্‌ল!

—"একি শ্রী! অকারণে কাঁদ্‌চ কেন?"

—"এবার আমায় মাপ কর গো! আর-কখনো তোমার সন্দেহ কর্‌ব না!"

ইতি
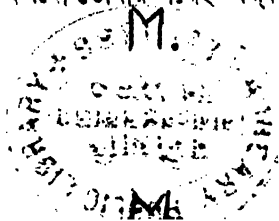
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়-লিখিত

পসরা (গল্পের বই) ... ... এক টাকা

মধুপর্ক (ঐ) ... ... আট আনা

জলের আল্পনা (উপন্যাস) ... ... দেড় টাকা

কাল-বৈশাখী (উপন্যাস) ... ... দেড় টাকা

প্রেমের-প্রেমারা (হাস্যনাট্য—
মিনার্ভায় অভিনীত) ছয় আনা

(প্রাপ্তিস্থান :—গুরুদাস লাইব্রেরী)

আলেয়ার আলো (উপন্যাস) ... একটাকা ছয় আনা

(প্রাপ্তিস্থান :—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ নং
কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

সিঁদুর-চুবড়ী (গল্পের বই) ... ... আট আনা

(প্রাপ্তিস্থান :—রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স,
৯০-২-এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা)

যন্ত্রস্থ

রসকলি (হাস্যোপন্যাস)

ফুলছড়ি (গল্পের বই)